মহাচীনে শ্রীনেহরু

মহাচীনে শ্রীনেহরু

'বার্তাবহ'

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর, ১৯৫৪

দাম : তিন টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস লিমিটেড্
১৫এ, ক্ষুদিরাম বোস রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশকের নিবেদন

'মহাচীনে শ্রীনেহরু' বইখানির লেখক একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর চীন ভ্রমণের সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে যে কয়জন বিশেষ প্রতিনিধি চীনে গিয়েছিলেন, ইনি তাঁদেরই একজন। প্রকৃত নাম প্রকাশে তাঁর আপত্তি থাকায়,—'বার্তাবহ' এই ছদ্মনামেই তিনি এই গ্রন্থের গ্রন্থকার বলে পরিচিত হ'তে চান। চীনের জনসাধারণ শ্রীনেহরুর মুখে নবজাগ্রত এশিয়ার অন্তরের যে-বাণী শুনেছেন, এই বইতে আছে তারই প্রতিধ্বনি। এই বইখানি যে সাংবাদিকের নীরস বর্ণনামাত্র নয়, তা বলাই বাহুল্য। প্রকাশভঙ্গীর চমৎকারিত্ব, বর্ণনার সরসতা এবং সুনিপণ বিশ্লেষণে বইখানি যে পাঠকসমাজে আদরণীয় হবে, সে বিশ্বাস আমার আছে।

প্রকাশক

ঃ উৎসর্গ ঃ

এ যুগের বাংলার পৌরুষ ও প্রতিভার

শেষ বিগ্রহ

শ্রীবিধানচন্দ্র রায়

শ্রদ্ধাভাজনেষু

প্রকাশক

বিষয়			পৃষ্ঠাসংখ্যা
ভূমিকা	...	...	১
হিন্দী-চীনি ভাই ভাই (কবিতা)—শ্রীহারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়			৩
পালাম থেকে পিকিং	...	...	৫
এশিয়ার ঝঞ্ঝাকেন্দ্রে	...	...	১৫
নয়া চীনের বর্ণচ্ছটা	...	...	২১
পিকিং-এ নেহরু	...	...	২৮
জনসভায় নেহরু	...	...	৩৯
মুকদেন-মাঞ্চুরিয়া-দাইরেন	...	...	৪৮
বিদায়ের পূর্বে	...	...	৫৪
পিকিং থেকে সাংহাই	...	...	৬১
সাংহাই থেকে কাম্বোডিয়া	...	...	৬৯
চীনে কি দেখলাম ?	...	...	৮১
সব শেষের কথা	...	...	৮৮
উপসংহার	...	...	১০৪
পরিশিষ্ট	...	...	১১১—১৫৬
(১) চীন-ভ্রমণান্তে কলিকাতায় বিরাট জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুর ভাষণ			১১১
(২) চীন-ভারত বাণিজ্যচুক্তি		...	১১৮
(৩) চীনা জন-গণতন্ত্রের সংবিধান		...	১২১
(৪) চীনের সংবিধানে ব্যবহৃত বাঙ্গলা পরিভাষা		...	১৫৪
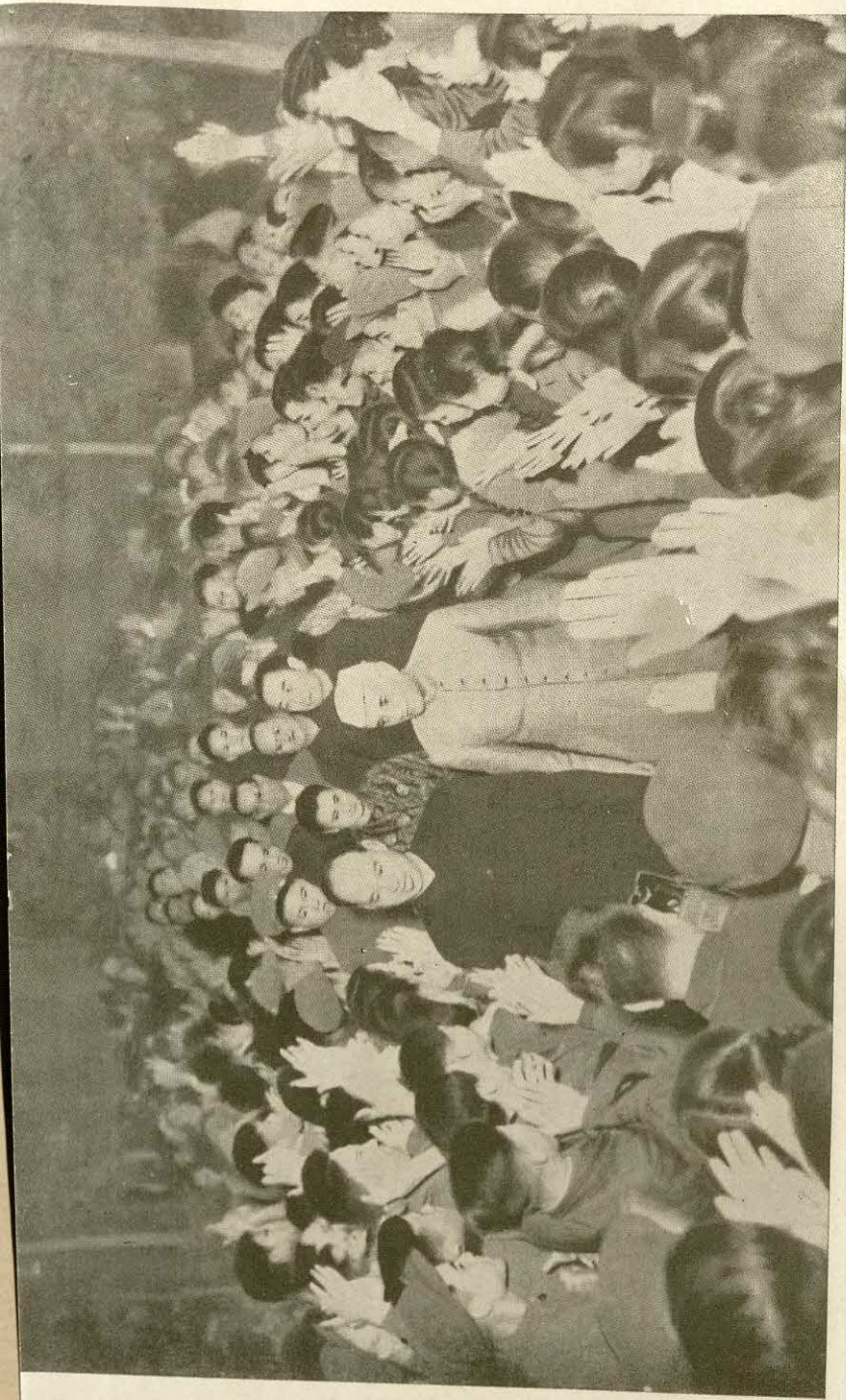
পিকিং-এর নাগরিকগণ কর্তৃক স্থানীয় চুংশান পার্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুকে বিপুল সম্বর্ধনা-জ্ঞাপনের দৃশ্য : শ্রীনেহেরুর ডান পাশে মেজর পেংচেনকে দেখা যাচ্ছে

ভূমিকা

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সাম্প্রতিক চীন ভ্রমণ সত্যই এক ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং বলেছেন: "আমার চীন সফর ভারত, চীন তথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।" তিনি আরও বলেছেন, "চীনের যেখানেই আমি গিয়েছি, সেইখানে সরকারী ও বেসরকারী উভয় মহলের নর-নারীরাই আমাকে অসীম শ্রদ্ধা ও সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছে।" এর আগে তিনি আরেকবার চীনে গিয়েছিলেন। তখন ভারতবর্ষ পরাধীন আর চীনও কুয়োমিণ্টাং কুশাসনের পঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন, তার ওপর সাম্রাজ্যবাদী জাপানের সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। আজ পটভূমি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র আর পণ্ডিত নেহরুই সেই স্বাধীন ভারতের কর্ণধার। চীনও আজ বিদেশীয় ও স্বদেশীয় সকল রকম অন্যায় শাসন ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে নতুন জনগণতন্ত্রী রাষ্ট্ররূপে এশিয়ায় প্রকাশমান। সেদিনের বিপ্লবী নায়ক ও বীর যোদ্ধারা মাও সে-তুং, চু-তে, চৌ-এন-লাই প্রমুখই আজ মহাচীনের শাসক ও নায়কের আসনে অধিষ্ঠিত। এমন দিনে চীন-ভারতের সৌহার্দ্য এক ঐতিহাসিক ঘটনা বৈ কি!

শ্রীনেহরু একদা ভারত আবিষ্কার করেছিলেন। এবার তিনি চীন আবিষ্কার করে ফিরে এলেন। এ আবিষ্কার কলম্বাসের আবিষ্কার নয়। ইতিহাসের জঠরে যে নবীন অভ্যুদয় জন্মলাভ করতে চলেছে এশিয়ার সূতিকাগারে, পণ্ডিতজী

চীন পরিদর্শনের ভেতর দিয়ে সেই অভ্যুদয়কেই আবিষ্কার করে হৃষ্টচিত্তে স্বদেশে ফিরে এসেছেন। সৌখীন পর্যটকের দৃষ্টি দিয়ে তিনি চীনকে দেখেন নি, তাঁর উদার দৃষ্টি সংকীর্ণ ভৌগলিক সীমা অতিক্রম করে দেখেছে এশিয়া মহাদেশকে, বাঁধতে চেয়েছে প্রতিটি দেশের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের নিবিড় বন্ধন। তাঁর চীন যাত্রা এইজন্যই ঐতিহাসিক। দু'হাজার বছর আগে ধর্ম ও সংস্কৃতির যে যোগসূত্র ছিল চীন ও ভারতের মধ্যে, তাই কি আজ এক নতুন রূপ নিয়ে এলো না আমাদের সামনে এই ঐতিহাসিক ভ্রমণকে উপলক্ষ্য করে? এশিয়ায় পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদের যে প্রভুত্ব একদা চীন ও ভারতের মাঝখানে দীর্ঘ ব্যবধান রচনা করেছিল, তাঁর এই ঐতিহাসিক ভ্রমণের ফলে সেই বাধা কি চিরদিনের মত অপসৃত হলো না? ভারতের মত চীনও শান্তি কামনা করে—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে শ্রীনেহরু এই কথা বলেছেন। সেই বিশ্বশান্তি এবং বিশ্বমৈত্রীর সার্থক প্রতিনিধি হিসেবেই ভারতের প্রধান মন্ত্রীর এই চীন-ভ্রমণ সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে সত্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ঘটনা সাময়িক হলেও এর একটা স্থায়ী মূল্য আছে। বইখানি লেখার এই কৈফিয়ৎ।

হিন্দী-চীনী ভাই ভাই

(শ্রীহারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)

[১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর চীনে মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে সাধারণতন্ত্রী সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৫৪ সালের ১লা অক্টোবর চীনা সাধারণ-তন্ত্রের পঞ্চম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে কবি এই সুন্দর কবিতাটি রচনা করেন। মূল ইংরেজীর বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো। সাংহাইয়ে অর্কেষ্ট্রাতে প্রধান মন্ত্রীকে এই কবিতাটি শোনান হয়েছিল। চীনা তরুণ-তরুণীর মুখে মুখে এই কবিতাটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।]

আলোর জন্যে অন্ধকারে আর তো হাঁতড়ে
বেড়াতে হবে না আমাদের এই পৃথিবীকে।
ব্যথিত বঞ্চিতের জীবনে অমা-রজনী শেষ
এই তো আশা আজিকার ইতিহাসের।
লক্ষ কোটি মানুষের নিদ্রাহীন ক্রন্দন,
সেই কালরাত্রির হলো আজ অবসান।
আকাশ ডুবে গেল নতুন্ প্রভাতের আলোয়
"হিন্দী-চীনী ভাই ভাই", কণ্ঠে শুধু এই গান।

দুই দেশের কোটি কোটি মানুষ আমরা
হাতে হাতে আর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভাই
তালে তালে পা ফেলে ছুটব আজ সামনে।
প্রভাতের সূর্যকে তুলে আনব পুলকে
তুলে আনব শান্তির শাশ্বত সূর্যকে।

সেই তো নতুন সূর্য ঝলমলিয়ে উঠবে
এশিয়ার উদার আকাশের পূর্বাচলে।
"হিন্দী-চীনী ভাই ভাই", এক সাথে চলে।

নেহরু-মাও দুই নেতা করেছেন মিতালী
এশিয়ায় চম্‌কে যায় প্রীতির দেওয়ালী।
হিমালয় শিরে ওঠে আজ এ কী কলরোল
ইয়াংসি থেকে গঙ্গায় জাগে উতরোল।
জাগে নব নবীনের দুর্বার অভিযান
এশিয়ার মঞ্চে বাজে শান্তির ঐক্যতান।
লাখো মানুষের কণ্ঠে ওঠে মিলনের সুর
"হিন্দী-চীনী ভাই", নয় তো তারা দূর।

এক

পালাম থেকে পিকিং

১৫ই অক্টোবর, ১৯৫৪।

ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু চলেছেন মহাচীনে শান্তির পতাকা বহন করে আর কণ্ঠে নিয়ে বিশ্ব-মৈত্রীর উদার বাণী। সুদূর অতীতে একদা এই ভারতবর্ষ থেকে বুদ্ধদেবের বাণী গিয়েছিল চীনদেশে, আর সেদেশ থেকে এসেছিল কত চৈনিক পরিব্রাজক ভারতের কাছে ভারত-সংস্কৃতিতে দীক্ষা নেবার জন্যে। তাই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে ভারত অতীতে যেমন মিলিত হয়েছিল, আজ আবার বহু শতাব্দী পরে রাজনীতির ক্ষেত্রে এশিয়ার এই দুই মহান জাতি মিলিত হতে চলেছে। এই মিলনের অগ্রদূত হিসেবেই পণ্ডিত নেহরু চলেছেন চীনে, যেমন কিছুদিন পূর্বে ভারতে এসেছিলেন চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই।

১৫ই অক্টোবর, সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে পণ্ডিত নেহরু, কন্যা প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন দিল্লীর পালাম বিমান ঘাঁটিতে। অন্যান্য বিশিষ্ট কর্মচারীদের মধ্যে তাঁর চীন-যাত্রার সাথী হয়েছেন পররাষ্ট্র-দপ্তরের সেক্রেটারী-জেনারেল মিঃ এন. আর. পিল্লাই। ভারতীয় বিমান বাহিনীর একখানি ডাকোটা বিমান তৈরী। সুদক্ষ ফ্লাইট লেফটেনান্ট এফ. ডি. ইরানী সেই বিমান চালিয়ে নিয়ে যাবেন।

যাবার আগের দিন, ১৪ই অক্টোবর, নয়া দিল্লীতে দু-বছরের জন্য স্বাক্ষরিত হলো ভারত-চীন বাণিজ্য চুক্তি। এই ধরণের চুক্তি এই প্রথম। চীন যাত্রার প্রাক্কালে প্রধান মন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই ঐতিহাসিক চুক্তির প্রয়োজনীয়তা ছিল। ভারত ও চীন যে ভাই ভাই আর ভারত ও চীনের জনগণের মধ্যে যে সৌহার্দ্য বিদ্যমান আছে, এই চুক্তি তাকেই সুদৃঢ় করে তুললো। চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ-এন-লাই-এর নয়া দিল্লী পরিদর্শনের সময় বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে এই আলোচনা আরম্ভ হয় এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রীর চীন-যাত্রার পূর্বেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সবেমাত্র প্রধান মন্ত্রী বিমান ঘাঁটিতে এসে পৌঁছলেন। তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের অবসরে আমরা এই চুক্তি সম্পর্কে দুই একটা কথা সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি। চীন ও ভারতের মধ্যে এই বাণিজ্য চুক্তি নানা কারণে ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করেছে। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জনবহুল দেশ দুটি—ভারত ও চীন। শুধু তাই নয়, এই দুটি দেশ পরস্পরের সীমান্তবর্তী এবং হাজার হাজার বছর ধরে এই দুটি দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও আর্থিক যোগাযোগ রয়েছে। জনবল ও প্রাকৃতিক সম্পদে উভয় দেশই খুব সমৃদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কয়েক বছর আগেও এই দুই দেশের কোন স্বাধীন সত্তা ছিল না। এই সময়ে ভারত ছিল বিদেশের পদানত এবং চীন ছিল বহু বিদেশী শক্তির অসংখ্য বন্ধনে আবদ্ধ। আজ ইতিহাসের মোড় ঘুরেছে। প্রাচ্যের মহাদেশতুল্য এই দুই দেশই আজ পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী এবং দুটি দেশেই জনসাধারণের আস্থাভাজন ও শক্তিশালী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত। কিছুকাল আগেও এই দুটি দেশ কৃষিপ্রধান ছিল এবং শিল্পদ্রব্যের ব্যাপারে দুটি দেশই ছিল

পরমুখাপেক্ষী। ফলে তুই দেশেরই জনসাধারণ ছিল দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে জর্জরিত। চীন ও ভারত তাই এখন শিল্পের প্রসারে মনোনিবেশ করেছে।

চুক্তির সূত্র এইখানেই। চীন ও ভারত এই তুটি দেশের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব ও পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানের চুক্তির মধ্যে ভবিষ্যতের যে একটা বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। ভবিষ্যৎ বলছি এই জন্য যে, চীন ও ভারত উভয়ই এখনও পর্যন্ত অনুন্নত দেশ। সেই কারণেই তুই দেশের জনসংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশী হলেও পৃথিবীর হাটে-বন্দরে তুই দেশের স্থান আজো অতি নগণ্য। বিশ্বের বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এশিয়ার এই তুই বিরাট দেশ যাতে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, সেই জন্যেই চীন ও ভারত একসঙ্গে কৃষি ও শিল্পের প্রসারে মনোনিবেশ করেছে। এই তুই দেশের ৮৪ কোটি অধিবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হলেই, তার ফলে যে পৃথিবীর বাণিজ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে, চীন-ভারত বাণিজ্য চুক্তি তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। তারপর তুই দেশ যদি পরস্পরের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য বিনিময়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহলে ভবিষ্যতে তুই দেশেরই অর্থনীতিক ক্ষেত্রে যে এক সুদূর প্রসারী পরিবর্তন দেখা দেবে এবং তার সুফল যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশও ভোগ করতে পারবে, এই চুক্তি তারই পূর্বাভাষ। একথা সত্য যে, ভারত ও চীনের রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মপন্থা ভিন্নমুখী কিন্তু একথাও সত্য যে রাজনৈতিক আদর্শের পার্থক্য থাকলেও অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে মিলনের পক্ষে কোন বাধা নেই। ভারত এর আগেই সোভিয়েট রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড,

বুলগেরিয়া প্রভৃতি সাম্যবাদ মতাবলম্বী দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। সেই অধ্যায়েরই শেষ পর্য্যায়ে এলো এই চীন-ভারত বাণিজ্য চুক্তি। এই চুক্তি শুধু কাগজে সই করা দলিল নয়—এর গুরুত্ব আরো বেশী। এই চুক্তির ফলে চীনের সঙ্গে ভারতের অর্থনীতিক সম্পর্ক যে দিন দিন নিবিড়তর হবে তা নয়, চীনের সঙ্গে ভারতের সৌহার্দ্যও আরো বৃদ্ধি পাবে এবং চীন গভর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর চীন-ভ্রমণকে তারই সূত্রপাত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

চীন-ভারত বাণিজ্য চুক্তির অন্তরালে আর একটা বড় সত্য রয়েছে। আমাদের প্রধান মন্ত্রী তার মর্ম উদ্ঘাটন করে চীন-যাত্রার প্রাক্কালেই বলেছেন: "চীনের সঙ্গে চুক্তির ব্যাপারে যে পাঁচটি নীতি মেনে নেওয়া হয়েছে, তাই দুই দেশের মধ্যে বোঝাপড়ার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী। এর দ্বারা আক্রমণ বা হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা দূর হয়েছে। এই নীতি বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রয়োগ করলে কোন রকম সংঘর্ষ ঘটবার সম্ভাবনা থাকবে না। এই চুক্তির ভেতর দিয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া কিম্বা সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হোক—এই আমার অন্তরের কথা, এই আমার দেশের ও জাতির অভিপ্রায়। আজকের দিনের একটা প্রধান ঘটনা এই যে সমগ্র এশিয়ায় চলেছে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই পরিবর্তন নানারূপ নিয়েছে এবং এ এখনও সক্রিয় রয়েছে। এই পরিবর্তন ইতিহাসের অভিপ্রেত, কাজেই অন্য দেশ এই পরিবর্তন পছন্দ করছে না বলে এর অগ্রগতি বন্ধ হবে না।" চীন-যাত্রী ভারতের প্রধান মন্ত্রীর কণ্ঠে ছিল এই বাণী।

* * * *

"কেন আপনি চীনে যাচ্ছেন ?"

হাজার লোকের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনেহরু তাঁর চীনযাত্রার উদ্দেশ্য বিবৃত করে বললেন—"কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি সেখানে যাচ্ছিনা। চীনের প্রধান মন্ত্রী ভারতে এসেছিলেন, তাই প্রধানত শিষ্টাচার ও সৌজন্যের খাতিরে আমিও ঐ মহান দেশ দেখতে যাচ্ছি।"

"তবু একেবারে কোনো উদ্দেশ্য নেই আপনার ?"

"তা অবশ্য আছে। দিল্লীতে চীনের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আমার যে আলোচনা শুরু হয়েছিল, তারই সূত্র ধরে আমি সেখানে গিয়ে আরো আলাপ আলোচনা করব, যাতে দুই দেশের মধ্যে আরো বেশী সৌহার্দ্য ঘট্তে পারে। কেন না আমি বিশ্বাস করি যে, ভারত ও চীনের মতো দুটি মহান দেশের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া শুধু এশিয়ার নয়, সমগ্র পৃথিবীর শান্তি রক্ষার পক্ষেই অপরিহার্য।"

"সেখানে গিয়ে আপনি কোন্ কোন্ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন ?"

"লোকে চিরদিন সমস্যা নিয়েই আলোচনা করে। সমস্যা নিয়ে আমি বেশী মাথা ঘামাব না। দুই চোখ ভরে শুধু দেখে আসব জাগ্রত চীন কি ভাবে সমৃদ্ধির পথে চলেছে।" আর কোন প্রশ্ন করবার বা উত্তর দেবার সময় নেই। এবার যাত্রা করতে হবে। প্রথমে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ। রাষ্ট্রপতির বিশেষ ডাকোটা বিমানে প্রধান মন্ত্রী চলেছেন মহাচীনে। দিল্লীর চীনা দূতাবাসের কর্মচারিগণ প্রধান মন্ত্রীকে ফুলের মালা ও তোড়া উপহার দিলেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণও প্রধান মন্ত্রীকে

বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এসেছেন। কন্যা ইন্দিরাকে নিয়ে পণ্ডিত নেহরু ঠিক সময়ে হাসিমুখে বিমানে উঠলেন। দিল্লীর আকাশে তখন উজ্জ্বল প্রভাতের প্রসন্নতা। নেহরুর মুখে হাসি আর কণ্ঠে জয় হিন্দ্!

* * * *

১৯শে অক্টোবর।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এসে পৌঁছলেন পিকিংয়ে। সে কী বিপুল সম্বর্ধনা। বিমান ঘাঁটি থেকে সহর পর্যন্ত দশ মাইল রাস্তার দু'দিকে সমবেত দশ লক্ষ নর-নারী হর্ষধ্বনি করে ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালো।

বিমান ঘাঁটিতে দাঁড়িয়েই তিনি সমবেত সেই জনতার উদ্দেশে বললেন—"আপনাদের কাছে আমি আমার দেশবাসীদের শুভেচ্ছা বহন করে এনেছি।"

ভারতীয় ও চীনা পতাকায় সজ্জিত ভারতীয় বিমানবাহিনীর ডাকোটা বিমানখানি পিকিংয়ের বিমান ঘাঁটিতে ধীরে ধীরে নাম্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে সেইদিকে এগিয়ে এলেন চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই, নব্যচীনের রাষ্ট্রগুরু সান-ইয়াৎ-সেনের বিধবা পত্নী মাদাম সান্-ইয়াৎ-সেন, মন্ত্রী সভার সদস্যগণ আর পিকিংয়ের বিভিন্ন রাষ্ট্রের কূটনীতিক প্রতিনিধিবর্গ। সমবেত জনতার বিপুল হর্ষধ্বনি আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুল্‌লো। চীনা সামরিক ব্যাণ্ডবাদকদল গাইল চীনের জাতীয় সঙ্গীত আর ভারতের জাতীয় সঙ্গীত "জনগণ-মন অধিনায়ক"। বিমান থেকে নেমে ভারতের প্রধান মন্ত্রী উঠলেন সামনের একটা সুউচ্চ মঞ্চের ওপর। সেই মঞ্চ থেকে তিনি গ্রহণ করলেন চীনা সৈন্যদের অভিবাদন। তারপর ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে সর্বপ্রথম সম্বর্ধনা জানালেন

চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ-এন-লাই। সঙ্গে সঙ্গে জনতার কণ্ঠে ধ্বনি উঠ্‌লো "চীন-ভারত মৈত্রী জিন্দাবাদ", "আমরা বিশ্বশান্তি চাই।" অমনি শ্রীনেহরু খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে তাদের দিকে তাঁর হাত দুখানি বাড়িয়ে দিয়ে সপ্রীতিভরে আন্দোলিত করলেন।

* * * *

ভারতের প্রধান মন্ত্রী চীনে আসছেন। পিকিং নগরীর সে কী উৎসব সজ্জা। মনে হোল যে, রাজধানীর সমগ্র অধিবাসী যেন বিমানঘাঁটিতে আর বিমানঘাঁটি থেকে শহর পর্যন্ত দশ মাইল সড়কের দুই দিকে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছে। দোকানপাট স্কুল অফিস সব বন্ধ। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়েছে আজ। চীনে নতুন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবার পর শ্রীনেহরুর এই প্রথম আগমন। এর আগে চীনে কোন বিদেশী রাষ্ট্রনায়ক এমন বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন নি। শ্রীনেহরুর সম্বর্ধনার ভেতর দিয়ে জাগ্রত চীন যেন জাগ্রত ভারতকেই জানালো তার হৃদয়ের অকৃত্রিম সৌহার্দ্য।

* * * *

পিকিং বিমান ঘাঁটির সুউচ্চ মঞ্চে দাঁড়িয়ে চীনের জনসাধারণের উদ্দেশে আবেগময় কণ্ঠে হিন্দুস্থানী ভাষায় ভারতের প্রধান মন্ত্রী বললেন, "অনেক দিন থেকেই চীন পরিদর্শনের ইচ্ছা আমার মনে ছিল। আজ সে ইচ্ছা পূর্ণ হলো। সুদূর অতীতকাল থেকেই ভারত ও চীনের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তারা পরস্পরকে জানতো। কিন্তু পরবর্তীকালে এমন কয়েকটি অন্তরায় দেখা দিল, যার ফলে সেই মধুর সম্পর্ক হ্রাস পেতে থাকে। আজ আবার আমরা পরস্পরের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছি; পরস্পরকে চিনতে ও জানতে আরম্ভ করেছি। আজ ইতিহাসের

গতি পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তিত এই অবস্থায় পরস্পরকে জানার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের এই দুটি অতি বৃহৎ দেশের সম্মুখে বহু সমস্যা ও বহু দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের দুটি দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা যতই বৃদ্ধি পাবে, ততই তা কেবলমাত্র আমাদের নয়, সমগ্র এশিয়ার এবং এমন কি সমগ্র বিশ্বের ঘটনাবলীর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। আজ পৃথিবীতে শান্তির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। সহযোগিতা ও মৈত্রীর দ্বারা শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। আশা করব আমার চীন পরিদর্শনের ফলে ভারত ও চীনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের দুটি দেশ পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনে সাহায্য করবে।”

বক্তৃতা থামলো। মাদাম সান-ইয়াৎ-সেন এগিয়ে এসে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর করমর্দন করে বললেন—“এশিয়ায় ও সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন প্রচেষ্টায় আপনি আজ এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছেন। গত পাঁচ বছরে দেশকে গড়ে তোলার ব্যাপারে যে সামান্য সাফল্য আমরা অর্জন করেছি তা লাভ করতে আমাদের যে কত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছে, তা আপনার দেশের জনগণ তাদের নিজেদের দীর্ঘ সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করতে পারবেন বলেই আমরা আশা করি। এই দেশ পরিদর্শন করবার সময় আমাদের পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন—এ আশাও আমরা করি। আপনাকে উপলক্ষ্য করে আমরা আজ বুদ্ধদেব ও গান্ধীর ভারতকে নতুন করে অভিবাদন জানাই।”

* * *

পিকিংয়ে পৌঁছে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শ্রীনেহরু চীনা-

প্রজাতন্ত্রের চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, এবং তাঁর সঙ্গে দেড়ঘণ্টাকাল আলোচনা করলেন। এশিয়ার দুই মহান নেতা পরস্পরের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তাঁদের অন্তরের ভাব বিনিময় করলেন। মাও-সে-তুঙের কথার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠ্‌লো পণ্ডিত নেহরুর প্রতি শ্রদ্ধা আর ভারতের প্রতি প্রীতি। দুই মহান নেতা পরস্পরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে যেন উপলব্ধি করলেন যে, এশিয়া মহাদেশের তলদেশ দিয়ে যে নতুন ভাবাবেগ এতদিন অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো অলক্ষ্যে প্রবাহিত হচ্ছিল, অথচ প্রতিকূল অবস্থার পাষাণচাপে প্রতিহত হয়ে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছিল না, তা সহসা আজ পাতাল ফুঁড়ে মাটির ওপরে উঠে এসেছে দিল্লীতে ও পিকিংএ। দিল্লীতে চৌ-এন-লাইএর সম্বর্ধনা আর পিকিংএ নেহরুর সম্বর্ধনা—এই দুই স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনার ভেতর দিয়ে ইতিহাস যেন উচ্চকিত স্বরে কথা বলে উঠেছে। দিল্লীর ধারা এসে মিলল পিকিংএর ধারার সঙ্গে—এই দুই ধারার মিলিত প্রবাহের বন্যায় একদিন সমগ্র এশিয়ার অন্তর প্লাবিত হবে—নেহরু ও মাও-সে-তুঙ কি এই ভবিষ্যতই কল্পনা করলেন না মুখোমুখী দাঁড়িয়ে? ভারতের অদৃষ্টের সঙ্গে চীনের নিয়তি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—এ কথাও বোধ হয় দুই রাষ্ট্রনেতার চিন্তায় একটা মৃদু কম্পন জাগিয়ে গেল নানা বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে। কিন্তু এও বাহ্য।

কেবলমাত্র সামাজিক শিষ্টাচারের খাতিরে প্রতি-পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে শ্রীনেহরু চীনে আসেন নি। তার চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে তিনি এসেছেন এখানে। নেহরু ও মাও-সে-তুঙের চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌লো ম্যানিলায় স্বাক্ষরিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রতিরক্ষা চুক্তি। এই চুক্তির

উদ্দেশ্য এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোকে সামরিক সংহতির মাধ্যমে একজোট করা। পণ্ডিত নেহরু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্যে অগ্রসর হয়েছেন। এর জন্যে তাঁর হাতে অস্ত্র আছে মাত্র একটি—তিব্বত সম্পর্কে সম্পাদিত চীন-ভারত চুক্তিপত্রের মুখবন্ধে লিপিবদ্ধ পঞ্চশীল যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত পারস্পরিক প্রীতি, শান্তি ও প্রতিবেশীসুলভ সভ্য ও সহযোগিতার ওপর। ম্যানিলা চুক্তির উদ্দেশ্য ও কর্মতৎপরতা যদি ব্যর্থ করতে হয়, তাহলে ভারত ও চীনের দ্বারা সমানভাবে স্বীকৃত পঞ্চশীলের ওপর ভিত্তি করেই এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং এশিয়ার বৃহত্তম দুই দেশ হিসেবে সে প্রচেষ্টায় উদ্যোগী ও অগ্রণী হতে হবে ভারত ও চীনকে অর্থাৎ নেহরু ও মাও-সে-তুংকে—ভারত-চীনমৈত্রীর এই গুরুত্বই কি উপলব্ধি করলেন দুই মহান নেতা মুখোমুখী দাঁড়িয়ে?

দুই

এশিয়ার ঝঞ্ঝাকেন্দ্রে নেহরু

চীনের পথে ভারতের প্রধান মন্ত্রী রেঙ্গুন হয়ে ভিয়েৎনাম এলেন ১৭ই অক্টোবর বিকেলে। হ্যানয়ের জিয়ালাম বিমানঘাঁটিতে এসে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর ডাকোটা থাম্‌লো। সুসজ্জিত বিমান ঘাঁটি—ভারতীয় ও ভিয়েৎমিন জাতীয় পতাকা বাতাসে দুলছে। আরো সব পতাকায় লেখা ছিল—"ভিয়েৎনাম ও ভারতের মৈত্রী চিরস্থায়ী হোক।" বিমান থেকে অবতরণ করতেই ভিয়েৎমিন সৈন্যরা শ্রীনেহরুকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করল এবং তরুণ ভিয়েৎ-নামীরা তাঁকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করল। সম্বর্ধনার মধ্যে আন্তরিকতার স্পর্শ অনুভব করলেন ভারত-সূর্য। তারপর শ্রীনেহরু যখন বহু তোরণ-শোভিত তিন মাইল দীর্ঘপথ অতিক্রম করে মেট্রোপোল হোটেলে এলেন, তখন পথের দুই দিকে হাজার হাজার ভিয়েৎনামী সমবেত হয়ে উল্লাসধ্বনির সঙ্গে সম্বর্ধনা জানালো তাঁকে।

হ্যানয়ে পৌঁছেই শ্রীনেহরু ভিয়েৎমীনের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ হো-চি-মিন ও অন্যান্য ভিয়েৎমীন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক ভোজসভায় মিলিত হন। ভোজসভার উষ্ণ আদর-আপ্যায়নের অবসরে আমরা পাঠকদের সঙ্গে একবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই ঝঞ্ঝাকেন্দ্রটির একটু পরিচয় করিয়ে দিই।

বিশাল এশিয়া মহাদেশের ঠিক দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ভূভাগ যেখানে ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের সন্ধিস্থলকে

পৃথিবীর এই অঞ্চলের সামুদ্রিক পথের একটা প্রধান মোড়ে পরিণত করেছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেই কোণের দেশটাই ফরাসী-ইন্দোচীন। আর ভিয়েৎনাম সেই ইন্দোচীনের সবচেয়ে বড় ও প্রধান অংশ। ইন্দোচীনের সমগ্র পূর্বাংশ এই ভিয়েৎনামের চীন-সাগর ও টংকিং উপসাগর। ভিয়েৎনাম তিনটি প্রদেশে বিভক্ত। উত্তরে টংকিং, মধ্যে আনাম ও দক্ষিণে কোচিন-চায়না। রাজধানী দু'টি, উত্তরে টংকিংএ হ্যানয়, আর দক্ষিণে কোচিন-চায়নায় সায়গন।

ইন্দোচীনের সামরিক গুরুত্ব বড় কম নয়। সমস্ত ইন্দোচীন দেশটি দেখতে একটা উপদ্বীপের মতো। দুই মহাসাগরের সন্ধিস্থলে এই উপ-দ্বীপ একটা সমকোণ সৃষ্টি করায় এর চেহারাটা হয়েছে মোড়ের বড় বাড়ির গাড়ি-বারান্দার মত, যেখানে দাঁড়িয়ে সমস্ত মোড়টা পাহারা দেওয়া যায়। আর সামুদ্রিক পথের এই মোড়টার গুরুত্ব অপরিসীম। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সামুদ্রিক গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মধ্যে সিঙ্গাপুর থেকে হংকং-এর পথে এই মোড় সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায়, ইন্দো-চীনের সঙ্গে বৃটেন ও আমেরিকার স্বার্থ জড়িত ; তাই তারা বলে ইন্দোচীন হাতছাড়া হলে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হাতছাড়া হবে।

এই গুরুত্বের সবটাই ভিয়েৎনামের এলাকা আর ইন্দোচীনের মুক্তি-সংগ্রামেরও প্রায় সবটাই এই ভিয়েৎনামের মুক্তি-সংগ্রামেরই ইতিহাস। ইন্দোচীনের মুক্তিসংগ্রামে ভিয়েৎনামই নেতা, তাই ভিয়েৎনামের মুক্তি-সংগ্রামই ইন্দোচীনের মুক্তি-সংগ্রাম। ফরাসী শাসনের অধীনে ভিয়েৎনাম, লাওজ ও কাম্বোডিয়া—এই তিনটি পৃথক রাজ্য মিলে ফরাসী-ইন্দোচীন নামে পরিচিত হয়। এদের মধ্যে ভিয়েৎনামই প্রধান ; এর লোকসংখ্যা প্রায় ২ কোটি।

১৯০৪।৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় থেকেই ভিয়েৎনামীরা বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ হয়। ১৯১৩ সালে প্রথম বৈপ্লবিক যুগ শেষ হওয়ার

পর ১৯১৭ সালের রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব ভিয়েৎনামী বিপ্লবীদের নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। রাজতন্ত্রের আদর্শ পরিত্যাগ করে তারা গণতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করে। এ যুগের ইতিহাস বিপ্লবের নেতা হো-চি-মিনের জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। নয়াচীনের নেতা মাও-সে-তুংয়ের মতই হো-চি-মিনও জন্মবিপ্লবী। বিপ্লবীর প্রতি বিপ্লবীর আকর্ষণ স্বাভাবিক, তাই না শ্রীনেহরু চীনের পথে ভিয়েৎনামের মুক্তিসংগ্রামের বিপ্লবী নেতা হো-চি-মিনের সঙ্গে মিলিত হলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে জাপানের আত্মসমর্পণের পর হো-চি-মিন রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করেন এবং ১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর ভিয়েৎনাম ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন। তারপর ১৯৪৬ সালের গোড়ায় সারা ভিয়েৎনামের পিপলস্ এসেম্বলির নির্বাচনে হো-চি-মিন প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন।

এদিকে জাপানের ফরাসী তাঁবেদারেরা জাপানের আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত ছিল না ; অন্যদিকে উত্তর সীমান্ত থেকে চিয়াংকাইশেকের ফৌজ ভিয়েৎনামে অনধিকার প্রবেশ করল জাপানীদের অস্ত্র সমর্পণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে। এই জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে হো-চি-মিনের রাজনৈতিক প্রতিভারই জয় হলো। তিনি ফরাসী কর্তৃপক্ষকে দলে টেনে নিয়ে চিয়াং ফৌজকে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। ফরাসী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সামরিক চুক্তি হলো, ফরাসী সরকার স্বাধীন ভিয়েৎনাম সরকারকে মেনে নেবে এবং ভিয়েৎনাম রিপাবলিক ফ্রান্সের সঙ্গে মিলে এক ফরাসী ইউনিয়ন গঠিত হবে।

ভিয়েৎনামের ফরাসী শক্তি তখনও যুদ্ধ ক্ষত লেহন করছে। তার ৮০ বছরের সাম্রাজ্য রক্ষা করার ক্ষমতা ফুরিয়ে এসেছে। কাজেই সেও তখন ঐ সর্ত মেনে সন্ধি করল। রিপাবলিকের

প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হবার পর হো-চি-মিন মে মাসে প্যারিসে গেলেন ফ্রান্সের সঙ্গে একটা পাকা চুক্তির উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু প্যারিসে এসে হো-চি-মিন বুঝলেন, যুদ্ধজয়ের পর সাম্রাজ্যবাদী আবার তার নিজ মূর্তি ধরেছে এবং সে সহজে তার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ছাড়বেনা। দেশে ফিরে হো-চি-মিন নিজের শক্তিকে সংহত করায় মন দিলেন। এদিকে ফ্রান্সও বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গে পরামর্শ এঁটে এবং তাদের সাহায্যের ভরসা পেয়ে প্রস্তুত হচ্ছিল। এই অবস্থায় তারা ১৯৪৬ সালের ১৯শে ডিসেম্বর অকস্মাৎ হ্যানয়ের ওপর সসৈন্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সেদিন জেনেভায় যে যুদ্ধের বিরতি চুক্তি হলো (জেনেভার এই সম্মেলন থেকেই চৌ-এন-লাই নয়া দিল্লী এসেছিলেন), সেই যুদ্ধের গোড়া ঐখানে। হো-চি-মিনও প্রস্তুত ছিলেন; তিনিও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সমগ্র ইন্দোচীনের জনগণ তাঁর পেছনে দাঁড়াল। তারপর দিয়েন-বিয়েন দুর্গের অবরোধ ও পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোচীনের উপকূলে ফরাসীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের চির-সমাধি রচিত হয়।

* * * *

ভোজ-সভায় বিপ্লবী নেতার নিজ মুখে ভারতের প্রধান মন্ত্রী হয়ত শুনে থাকবেন, কি করে ইন্দোচীনে ইতিহাসের পট পরিবর্তন হলো এবং মুক্তি-সংগ্রামের নায়ক হো-চি-মিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজের সংগ্রামী জীবনের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে, হয়ত বা তিনি সেই বিপ্লবী নেতাকে একান্তে বলে থাকবেন—"ফরাসী ত গেল, কিন্তু ডলার সাম্রাজ্যবাদের প্রখর দৃষ্টি এখনও রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই ঝঞ্চা-কেন্দ্রটির ওপর, অতএব বন্ধু, হুঁসিয়ার!"

* * * *

ডাঃ হো-চি-মিনের সঙ্গে সাক্ষাতের আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল

শ্রীনেহরুর। জেনেভাতে ইন্দোচীন যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পর্কিত যে আন্তর্জাতিক তদারকী কমিশন গঠিত হয়েছে, ভারতবর্ষ শুধু সেই কমিশনের সদস্য নয়; একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও অপেক্ষা করছে ভারতবর্ষের জন্য অদূর ভবিষ্যতে। হ্যানয়ে দুই নেতার প্রথম সাক্ষাতের সময় ভিয়েৎমিন প্রেসিডেন্ট ডাঃ হো-চি-মিন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুকে অনেকক্ষণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে রাখেন। প্রেসিডেন্ট অথচ অনাড়ম্বর পরিচ্ছদে তিনি এলেন স্বাগত জানাতে ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে। সম্মানচিহ্ন-বর্জিত গলাবন্ধ ছাই রংএর কোর্তা পরে ভিয়েৎমিন নেতা যখন সরকারী ভবনের সিঁড়িতে শ্রীনেহরুকে স্বাগত জানান, তখন তাঁর পায়ে শুধু এক জোড়া চটি ছিল, তিনি মোজা পর্যন্ত পরেন নি। শ্রীনেহরুর সম্মানে অনুষ্ঠিত সরকারী ভোজ-সভায় ভিয়েৎমিন গভর্ণমেণ্টের অধিকাংশ সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। ভোজের সময় বহুবার উভয় দেশের মৈত্রীর সাফল্য কামনা করা হয়। তারপর ডাঃ হো ও শ্রীনেহরু ঘরোয়া আলোচনার জন্যে কক্ষান্তরে চলে যান।

১৮ই অক্টোবর।

হানয়ে ডাঃ হো-র সঙ্গে যে সাক্ষাৎকার ঘটে, তা দুই নেতার মধ্যে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎকার। এর আগে আর কখনও উভয়ের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয় নি, যদিও সে সুযোগ এসেছিল একবার ১৯৪৬ সালের জুন মাসে। হোচি-মিন তখন বারজন ভিয়েৎমিন প্রতি-নিধিদের সঙ্গে চলেছেন প্যারিসে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যে। সময় খুব কম ছিল বলে তিনি পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে তখন ইচ্ছা সত্ত্বেও সাক্ষাৎ করতে পারেননি; শুধু একজন সাংবাদিকের হাত দিয়ে নেহরুর কাছে তাঁর স্বাক্ষরিত একখানা

[illegible] পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রুদ্ধদ্বার কক্ষে দুই নেতার মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর ভিয়েৎমিন বেতারে যুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হলো এই মর্মে: "আমরা পরস্পরের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং ডাঃ হো-চি-মিন ইন্দোচীন যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক তদারকী কমিশনের কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন বলে শ্রীনেহরুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইন্দোচীনের অধিবাসীরা যাতে স্বাধীনভাবে এবং বাইরের হস্তক্ষেপ মুক্ত হয়ে সমৃদ্ধিলাভ করতে পারে তার জন্যে ডাঃ হো-চি-মিন ইন্দোচীনের অবশিষ্ট সমস্ত সমস্যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাধানের জন্য আগ্রহান্বিত।" ভোজসভায় প্রকাশ্য বক্তৃতায় শ্রীনেহরু বললেন—"দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার, এশিয়ার অবশিষ্ট অংশে এবং সারা পৃথিবীতে আমাদের এখনও অনেক বড় বড় সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য আমাদের সমস্ত শুভবুদ্ধি নিয়োগ করতে হবে। লক্ষ লক্ষ লোকের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত এই সমস্যাগুলির সমাধান প্রচেষ্টার মধ্যে মানবতা বোধের স্পর্শ থাকা অবশ্য দরকার।"

তিন

নয়াচীনের বর্ণচ্ছটা

আমার সাংবাদিক জীবনে এশিয়ার অনেক দেশেই গিয়েছি এবং সেই সব দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু এইবার ভারতের প্রধান মন্ত্রীর চীন-ভ্রমণের সঙ্গী হিসেবে চীনে এসে আমার কৌতূহলী দৃষ্টিতে এর নবজাগরণের যে অপূর্ব বর্ণচ্ছটা চোখে পড়লো তার একটু বিবরণ এখানে না দিয়ে পারলাম না। চীনে এর আগেও আমি গিয়েছি, কিন্তু তখন এর এমন বহুভঙ্গিম রূপ প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পাইনি। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল ভাষা বিভাগের বিখ্যাত অধ্যাপক চি-সিয়েন-লিনের সঙ্গে এবার আমার আলাপ হলো। ভারতের প্রধান মন্ত্রী চীনে এসেছেন, অধ্যাপকের মতে এটা শুধু শিষ্টাচার নয়, এই ঘটনার ভেতর দিয়ে অতীতের চীন-ভারত মৈত্রীর ইতিহাস যেন এক নতুন ভঙ্গীতে জীবন্ত হয়ে উঠ্‌লো। অধ্যাপক বল্‌লেন—"চীন ও ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সৌহার্দ্য হাজার বছর আগে থেকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে ; মহাকালের হস্তাবলেপে তার স্মৃতি আজো অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। হাজার বছর ধরে এই দুটি দেশ পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করে এসেছে এবং আমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক সব সময়ই ছিল আন্তরিকতাপূর্ণ। আমাদের মধ্যে হয়েছে সংস্কৃতির বিনিময়, আমরা শিখেছি পরস্পরের ভাষা, আমরা শ্রদ্ধা করেছি পরস্পরকে এবং আমরা একে অন্যের কাছ থেকে শিখেছিও অনেক।"
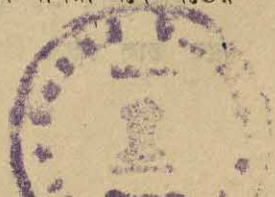
ভারতের প্রতি কি নিবিড় অনুরাগভরা এই কথাগুলি। আমার অন্তর স্পর্শ করলো সহজেই। চীনের রাজপথের দুই ধারে অগণিত জনতা যখন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে স্বাগত জানাচ্ছিল, তখন লক্ষ্য করলাম, চীনের জনগণের আন্তরিকতায় আমাদের প্রধান মন্ত্রীও বেশ অভিভূত হয়ে পড়েছেন। সদ্য জাগ্রত একটা জাতির প্রাণোচ্ছ্বাসের এই মহিমাকে প্রত্যক্ষ করতে করতে মনে পড়লো শ্রীনেহরুর বলিষ্ঠ পররাষ্ট্র নীতির কথা। পৃথিবীর অকমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভারতবর্ষই সর্বপ্রথম সাধারণতন্ত্রী এই নব্যচীনকে তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়েছিল। সেদিন সাম্রাজ্যবাদীদের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে শ্রীনেহরু যে রাষ্ট্রনীতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার যথার্থতা আজকে যেন হৃদয়মন দিয়ে উপলব্ধি করলাম। আমার মন একবার ছুটে গেল মুহূর্তের জন্য অতীতের দিকে।

১৯৪৯ সাল, ১লা অক্টোবর। দীর্ঘদিন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর মাও-সে-তুঙ্‌ প্রতিষ্ঠা করলেন সাধারণতন্ত্রী চীনের প্রথম গভর্ণমেন্ট। তারপর পাঁচ বছর কেটে গেছে। এই পাঁচ বছরে চীনের মানচিত্র বদলে গেছে; পুরাতন চীনের ধ্বংসস্তূপের ওপর আজ গড়ে উঠেছে উত্তুঙ্গ মহিমায় এক সম্পূর্ণ নতুন চীন। ভিতরে দেশ গঠনের কাজ যেমন চলেছে একটার পর একটা, তেমনি সমস্ত চীন এগিয়ে চলেছে সমৃদ্ধির পথে, প্রাচুর্যের পরে। নদীর বাঁধ তৈরী করা থেকে ইস্পাতের কারখানা—এমনি ছোটবড় কত যে শিল্পোদ্যম পরিকল্পনা অনুসারে সম্পন্ন হয়েছে তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না। এর কাহিনী পরে বলব।

বলছিলাম নয়াচীনের বর্ণচ্ছটার কথা। দেশের ভিতরে সমৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে বিশ্বরাজনীতিতেও চীনের সম্মান এই পাঁচ বছরে

কম বাড়েনি। চিয়াং কাইসেকের আসলে পৃথিবীর চোখে চীনের যে মর্যাদা ছিল আজ মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে সেই চীন উন্নত মস্তকে সগর্বে দাঁড়িয়ে উঠেছে বিশ্বরাজনীতির আসরে। আজকের দিনে বাইরে তার মর্যাদা আরো বেশী। কারো দাক্ষিণ্যের দুয়ারে হাত পেতে সে এই মর্যাদা লাভ করেনি, লাভ করেছে নিজের রাজনৈতিক প্রতিভার বলে। ১৯৫৪ সালে বিশ্বরাজনীতিতে চীনের মর্যাদা আর একবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল সেদিন জেনেভা সম্মেলনে। প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই জগতের সামনে চীনের পররাষ্ট্রনীতিকে যেভাবে তুলে ধরেছেন তা ইওরোপ ও আমেরিকার মনেও বিস্ময় জাগিয়ে তুলেছে। চিয়াং কাইসেকের চূড়ান্ত পতন এইখানে ঘোষিত হয়েছে।

শুধ্ আমাদের প্রধান মন্ত্রী কেন, ইংলণ্ডের শ্রমিক দলের নেতা মিঃ এটলী পর্যন্ত নয়াচীনের বর্ণচ্ছটায়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার অবিসম্বাদী নেতৃত্বে মুগ্ধ। সেদিন চীন ঘুরে এসে মিঃ এটলি পর্যন্ত বলেছেন—"যত শীঘ্র আমরা চিয়াং কাইসেকের হাত থেকে আর তার সৈন্যদের হাত থেকে অব্যাহতি পাই, এশিয়ার পক্ষে ততই মঙ্গল।" শুধু কি তাই? নরওয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সেদিন রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে স্পষ্টই বললেন—"রাষ্ট্রসংঘের কাউন্সিলে কমিউনিস্ট চীনের অনুপস্থিতি, এই সংস্থার অন্যান্য সভ্যদের নিকট কেমন যেন বিসদৃশ বোধ হয়।" রাষ্ট্রসংঘের বাইরে থেকেও চীন এর ওপর এক আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

"নয়াচীনের ইতিহাসে ১৯৫৪ সালটি দুটি কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে"—আমাকে একদিন বললেন অধ্যাপক চি-সিয়েন-লিন।

"কেন বলুন তো?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম কৌতূহলের সঙ্গে।

"প্রথম, এই বছরের ১লা অক্টোবর থেকে সমগ্র চীনে এক নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হলো"—

"সমগ্র চীনের অর্থ কি ? মায় ফরমোজা পর্যন্ত ?"

"হ্যাঁ, তালওয়ান্ ও ফরমোজা পর্যন্ত। আর দ্বিতীয়, এই একই অক্টোবর মাসে ভারতের প্রধান মন্ত্রী, বিশ্বের বরেণ্য শান্তিদূত, এশিয়ার সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আমাদের প্রধান মন্ত্রীর আমন্ত্রণে চীন পরিদর্শনে এসেছেন।"

"আপনাদের রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠাও হয়েছিল ১লা অক্টোবর। আমাদের কিন্তু ছুটো তারিখ আছে—১৫ই আগষ্ট আর ২৬শে জানুয়ারী।" এই বলে আমি একটু হাসলাম। অধ্যাপকও সেই হাসিতে যোগ দিলেন।

"কিন্তু আপনাদের নতুন শাসনতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের নতুন শাসনতন্ত্রের অনেক পার্থক্য আছে।" বললেন অধ্যাপক।

"যথা ?" জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"প্রথমেই দেখুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হবার আগে চীনের জনসাধারণের মতামত জানবার জন্যে মাত্র ৩২ পৃষ্ঠার একটা খসড়া তৈরী করে সেটা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়েছিল। সেই খসড়াটি লেখা হয় সম্পূর্ণ চীনাভাষায়। আর আপনাদের শাসনতন্ত্রের খসড়া ছিল ২০০ পৃষ্ঠার এবং সেটা লেখা হয়েছিল ইংরেজিতে আর ভারতের জনসাধারণের মধ্যে তা প্রচারিত হয়েছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার অনুবাদের ভেতর দিয়ে এবং শুনেছি মূল ইংরেজির চেয়ে সেইসব অনুবাদ ছিল খুব ছুর্বোধ্য।"

সত্যি কথা বলতে অধ্যাপকের এই সরল আলোচনায় আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। তাঁর কাছেই শুনলাম যে শাসনতন্ত্রের খসড়াটি আলোচনা করবার জন্যে চীনের জনসাধারণ তিন মাস

সময় পেয়েছিল। তারপর ২০শে সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সেই খসড়াটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় এবং ১লা অক্টোবর থেকে তা যথাযথভাবে কার্যকরী হয়। এই নতুন শাসনতন্ত্রের ভেতর দিয়েই আজ নয়াচীনের বর্ণচ্ছটা সমগ্র এশিয়াতে বিচ্ছুরিত হয়েছে। আর সবচেয়ে লক্ষ্য করার জিনিস হলো সমগ্র শাসনতন্ত্রের প্রত্যেকটি ধারার সহজ ও সরল প্রকাশভঙ্গী। ভাষার কোন মারপ্যাঁচ নেই, ভাব কোথাও অস্পষ্ট বা দ্বর্থ্যব্যঞ্জক নয়। জনগণের শাসনতন্ত্র যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনটি হয়েছে। চীনের শাসনতন্ত্রের প্রথম তিনটি ধারার মধ্যেই নয়াচীনের শাসনতান্ত্রিক রূপটি সমগ্রভাবে ধরা পড়েছে।

Art. 1. The People's Republic of China is a People's democratic State led by the working class.

Art. 2. All power in the People's Republic of China belongs to the People.

Art 3. The People's Republic of China is a unified, multi-national State.

অধ্যাপক বললেন, এই শাসনতন্ত্র রচনায় চীনের বর্তমান রাজনৈতিক কর্মবীরগণ চীনের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজনৈতিক বাস্তবতার ওপর বেশী জোর দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে আছে লক্ষ লক্ষ চীনা জনসাধারণের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এইসব কারণেই আমাদের এই শাসনতন্ত্র পুঁথিগত পাণ্ডিত্যের প্রতীক না হয়ে, একটা অতি বাস্তব ও সহজ জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরো বললেন, "অনেকের মনে একটা ধারণা রয়ে গেছে যে এই ব্যাপারে আমরা সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকরণ করেছি। কিন্তু এটা একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা জানবেন। রাশিয়ার প্রতি আমাদের

আছে একান্ত বন্ধুত্ব, আনুগত্য নয়। আমাদের সংবিধানের ৪ থেকে ১২নং ধারায় এই বিষয়টা খুব পরিষ্কার করে বলা হয়েছে।"

এর পর এই প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি আর তর্ক করিনি। বুঝলাম রাজনৈতিক আদর্শের ঐক্য থাকলেও, আসলে রাশিয়া রাশিয়া, চীন চীন অর্থাৎ চীনের নতুন শাসনতন্ত্রের ভেতর দিয়েই এই তথ্য নিঃসংশয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে, চীন রাশিয়ার তাঁবেদার রাষ্ট্র নয়, 'Equal Ally'—সমপর্যায়ের বন্ধু।

নয়াচীনের মনের কথা আমাদের প্রধান মন্ত্রীর কাছেও অজ্ঞাত নয়। আন্তর্জাতিক কার্যকলাপে চীনের নীতি ও লক্ষ্য হলো বিশ্ব-শান্তি এবং মানুষের সামগ্রিক উন্নতি। তাই শ্রীনেহরু তাঁর এই স্বল্প দিনের চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে পিকিং বেতারে যেদিন চীনের জনসাধারণের উদ্দেশে বললেন—"আমি জানি ভারতের মত চীনও শান্তি কামনা করে এবং শান্তিতে বসবাস করতে চায়"—সেদিন তাঁর নয়াচীনকে বুঝতে এতটুকু ভুল হয়নি। আজকের যুদ্ধ-বিক্ষত পৃথিবীতে সংশয় ও সন্দেহের যখন কিছুমাত্র নিরসন হয় নি, তখন বিশ্ব-শান্তির প্রচেষ্টায় চীন ও ভারতের যে একটা কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে, সে বিষয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেমন সচেতন দেখলাম, তেমনি সচেতন চীনের মাও-সে-তুঙ্ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

চীনে যাবার অনেক দিন আগে, নয়াচীনের উদ্দেশে এক বাণীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন :—"And now the wheel of fate has turned full circle and again India and China look towards each other and past memories crowd in their minds ; again pilgrims of a new kind cross or fly over mountains that separate them,

bringing their mesaages of cheer and goodwill and creating fresh bonds of friendship that will endure."

অর্থাৎ, "নিয়তির চক্র আজ সম্পূর্ণ ঘুরে গেছে। ভারত ও চীন আজ আবার পরস্পরের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে। বিগত দিনের স্মৃতি তাদের দুজনের মনেই ভীড় করে আসছে; যে বিশাল পর্বতমালা এই দুই দেশের মধ্যে ব্যবধান রচনা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আবার নতুন তীর্থযাত্রীদল সেই পর্বত অতিক্রম করবে এবং আনন্দ ও শুভেচ্ছার বাণী বহন করে নিয়ে আসবে এবং তা রচনা করবে বন্ধুত্বের নতুন ডোর যা চিরস্থায়ী হবে।"

ভারতের প্রধান মন্ত্রীর চীন ভ্রমণের সঙ্গী হিসেবে চীনে এসে তাঁর প্রতি সমগ্র চীনের স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনা দেখে মনের পটে অতীতের ইতিহাস বার বার উঁকি দিয়ে গেল—কত হুয়েন-সাঙ ভারতে এল ভারতের সংস্কৃতিতে দীক্ষা নিতে। আজ আবার তেমনি ভারতের কণ্ঠে শান্তির ললিত বাণী উচ্চারিত হয়েছে—সেই বাণীর প্রতিধ্বনি উঠেছে চীনের কণ্ঠে। চৌ-এন-লাই দিল্লী এলেন, নেহরু এলেন চীনে—এর ফলে এশিয়ার এই দুই মহান জাতির মধ্যে যে বন্ধুত্বের সূচনা হলো, এশিয়ার ইতিহাসে তা সম্পূর্ণ নতুন। আজ তাই নতুন শ্লোগান শুনি—'ভারত-চীন ভাই ভাই।'

চার

পিকিং-এ নেহরু

জীবনে সে দৃশ্য ভুলবার নয়!

১৯শে অক্টোবর পিকিং-এ পৌঁছেই ভারতের প্রধান মন্ত্রী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চীনের রাষ্ট্রনায়ক মাও-সে-তুঙের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেড়ঘণ্টাকাল আলাপ করলেন। এশিয়ার দুই মহান নেতার আলাপ-আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই,—উপরাষ্ট্রনায়ক জেনারেল চু-তে ও প্রধান সেনাপতি লিও-সাও আর শ্রীনেহরুর সঙ্গে ছিলেন পিকিং-এর ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী এন. রাঘবন্ ও নয়াদিল্লীর চীনা রাষ্ট্রদূত জেনারেল যুরান চুঙ্গ মিয়েন। আগামী চারদিনে যে সকল বৈঠক হবে এ তারই প্রথম বৈঠক।

শ্রীনেহরু ও চীনা নেতৃবৃন্দের মধ্যে এই যে ঐতিহাসিক অধিবেশন, এর ফল সুদূর প্রসারী ত বটেই, এমন কি এর ফলে এশিয়ার ঘটনাবলীর মোড়ও ঘুরতে পারে। তাই না সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আজ নিবদ্ধ এর ওপর এবং এরই বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করবার জন্য পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের বিশিষ্ট সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ এজেন্সীর নিজস্ব সংবাদদাতারা এই উপলক্ষ্যে চীনে এসেছেন। এত রিপোর্টারের সমাবেশ এর আগে খুব কমই দেখেছি। বহুকাল আগে ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহ উপলক্ষ্যে তাঁর ঐতিহাসিক ডাণ্ডী অভিযানের বিবরণ সংগ্রহ করবার জন্য ভারতে সেদিন ভারতের বাইরের

একাধিক দেশ থেকে রিপোর্টাররা এসেছিলেন। এক ভারতবর্ষ থেকেই নেহরুর চীন ভ্রমণের সংবাদ সংগ্রহের জন্যে আমরা দশ জন রিপোর্টার এসেছি। এবং চীনের জনসাধারণের আতিথ্য আমরাও কম উপভোগ করিনি।

বিকেল ৪-১৫ মিনিটে বিখ্যাত চিংচেন হলে আরম্ভ হলো নেহরু-মাও বৈঠক। এইখানেই চীনের রাষ্ট্রনায়ক মিঃ মাও-সে তুং-এর অফিস। চীন সরকারের বিশেষ আমন্ত্রণে মাদাম সান ইয়াৎ-সেন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দেখলাম। চীনা নেতাদের সঙ্গে মিঃ মাও কয়েক মিনিট আগেই হলের মধ্যে এলেন। শ্রীনেহরু দ্বারদেশে আসামাত্র মাও-সে-তুং নিবিড় সৌহার্দ্যের সঙ্গে তাঁর করমর্দন করলেন। অমনি রিপোর্টারদের ক্যামেরার ফ্লাস বাল্‌ব্‌ জ্বলে উঠলো। হলের মধ্যে প্রবেশের আগেই তাঁদের দুজনের ফটো নেওয়া হলো। দুজনকেই উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল।

এইখানে একটা কথা উল্লেখ করব। নেহরু-সম্বর্ধনায় চীনাদের যে শৃঙ্খলাপ্রিয়তা দেখলাম, তা বড় একটা কোথাও দেখিনি। বিমানঘাঁটি থেকে সেই দীর্ঘ পথে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে কম করে দশলক্ষ নরনারী তাঁকে সম্বর্ধিত করেছে—এত বৃহৎ জনতা, অথচ শৃঙ্খলাহীন কোলাহল, অসভ্যতা বা অশ্লীলতা কোথাও দেখা গেল না। যে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে এক পাও সে নড়েনি। এমন কি, ছেলেমেয়েরা এবং গ্রাম্য বৃদ্ধ বৃদ্ধারা পর্যন্ত ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে দেখার ও শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য অনড় শৃঙ্খলায় পথের দুই ধারে খাড়া দাঁড়িয়েছিল। তারপর চীনের সংবাদপত্রের সৌজন্যের কথা মনে পড়ে। দেখলাম, ভারতের প্রধান মন্ত্রীর পিকিং আসার সংবাদ পিকিং-এর সমস্ত খবরের কাগজে বড় বড় শিরোণামায় ছাপা হয়েছে। এমন কি বিমান ঘাঁটিতে নেহরু

যে বক্তৃতা করেন তারও সচিত্র পূর্ণ বিবরণ সব কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। চীনে নেহরুর সম্বর্ধনায় আনন্দ প্রকাশ করে 'কোয়াংসিন ডেইলী" পত্রিকা লিখলেন, "চীনের প্রধান মন্ত্রী ভারত সফর করে করে আসার পর ভারতের প্রধান মন্ত্রীর চীন সফর ভারত-চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এশিয়ায় বিভেদ সৃষ্টির জন্য মার্কিন রাষ্ট্রনেতারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে সামরিক জোট গঠন করেছে আজ তাই ভারত ও চীন উভয় দেশের প্রধান সমস্যা।" এখানকার আর একখানা জনপ্রিয় কাগজ হলো 'পিকিং ডেইলী ওয়ার্কার'। এই কাগজের এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পড়লাম লেখা হয়েছে "নেহরুর চীন সফরের ফলে ভারত ও চীনের মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ়তর হবে এবং এশিয়া তথা বিশ্বের শান্তি সংরক্ষণে সহায়তা করবে।"

* * * *

মাও-সে-তুং-এর সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর নেহরু সোজা চলে এলেন চৌ-এন-লাই-এর সম্বর্ধনা সভায়। এই সভায় তিনি ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করেন। সাধারণতন্ত্রী চীন সরকারের সরকারী ভবনের নিকটবর্তী চুঙ-নান-হাই প্রাসাদে এই সম্বর্ধনা সভার আয়োজন হয়েছিল। এই সম্বর্ধনা সভায় চীনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরগণ, বিভিন্ন রাষ্ট্রের দূতগণ এবং চীনে সফররত ভারতীয় শুভেচ্ছা মিশনের সদস্য সহ প্রায় ছয় শত আমন্ত্রিত নরনারী উপস্থিত ছিলেন। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। চীনা সরকার শুধু যে তাঁদের মাননীয় অতিথিকে নিয়েই ব্যস্ত তা নয়। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর কন্যা শ্রীইন্দিরা গান্ধী যাতে চীনের মহিলা সংগঠন সমূহের কর্মীদের এবং সমাজসেবিকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা করতে পারেন, সেজন্যে চীন সরকার এক বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন।

* * * *

২০শে অক্টোবর। আজ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানের জন্য এক ভোজসভার আয়োজন হয়েছে। এই ভোজসভায় ভারতের রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্য কামনা করে মিঃ চৌ বললেন; "আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে এশিয়ায় এবং সম্ভব হলে অন্যত্রও শান্তি এলাকা সম্প্রসারণের জন্য চেষ্টা করার যে নীতি ভারত গ্রহণ করেছে, চীন তা সমর্থন করবে এবং এই প্রচেষ্টায় আমরা ভারতের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে প্রস্তুত আছি।"

শ্রীনেহরু চীন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট মাও-সে-তুং-এর স্বাস্থ্য কামনা করে বললেন—"আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী দরকার হচ্ছে শান্তির। আমার এই বিশ্বাস হয়েছে যে ভারতের মত চীনের জনসাধারণও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহশীল! সহ-অস্তিত্ব ছাড়া স্থায়ী শান্তি সম্ভব নয়। এক জাতি যদি অন্য জাতির ওপর নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে, এক জাতি তার নিজের জীবনাদর্শ গ্রহণ করতে অন্য জাতিকে বাধ্য করবার চেষ্টা করে, তবে সংঘর্ষ অনিবার্য এবং তাতে শান্তি বিঘ্নিত হবেই। এইজন্যই আমরা এই দেশের ওপর অন্য দেশের প্রভুত্বের বিরোধী। শেষ বিচারে সব কিছুর ওপরে মানুষেরই দাম সবচেয়ে বেশী। চীন ও ভারতের প্রায় ১০০ কোটি মানুষের দানকে কখনই অগ্রাহ্য করা যাবে না। দিল্লী থেকে পিকিং আসার পথে অতীত ও বর্তমান ইতিহাসের সমগ্র দৃশ্যপট আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দুহাজার বছরেরও বেশী দিন দিন থেকে চীন ও ভারত পরস্পরকে চিনতে ও বুঝতে আরম্ভ করেছিল। তারপর দুই দেশের মধ্যে পর্যটন ও তীর্থযাত্রীর এক দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন ধারা চলতে থাকে। তাঁরা শুভেচ্ছার দূতরূপে দুই দেশের মধ্যে সংস্কৃতি ও ভাবের আদান প্রদান করেছেন। আমাদের দুই দেশের মধ্যে বিরোধের কোন নজির নেই, যে নজীর

আছে তা শুধু বন্ধুত্ব, বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের নজীর। এই দুই মহান প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে এই এক গৌরবময় ঐতিহ্য।"

* * * *

২১শে অক্টোবর।

আজ সকালে শ্রীনেহরু "নিষিদ্ধ নগরীর" প্রাচীন প্রাসাদগুলি দেখতে গেলেন। "নিষিদ্ধ নগরী" সিঙ রাজত্বের কালে তৈরী হয়। তখন এখানে সাধারণ নর-নারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল—কেবল রাজা-রাজড়া এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনেরাই এখানে প্রবেশ করতে পারতেন। সেইজন্যই এর নাম রাখা হয়েছিল নিষিদ্ধ নগরী। কিন্তু চীনে জনগণের সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর এটা জাতীয় যাদুঘরে পরিণত হয়েছে এবং চীনের যে কোন নর-নারীর এখন এখানে অবাধ-প্রবেশ। প্রধান মন্ত্রী এখানকার বিখ্যাত লামা মন্দিরটিও দেখতে গেলেন। এখানে আমরা দেখলাম ব্রোঞ্জ, চন্দনকাঠ ও পাথরের তৈরী কয়েকটি বুদ্ধ মূর্তি। একটি বুদ্ধমূর্তি পঞ্চাশ ফুটের বেশী উঁচু। মন্দিরের পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, প্রায় আটশো বছর আগে এই মূর্তিটি ভারত থেকে চীনে আনা হয়। মন্দিরের পরিবেশটি যেমন সুন্দর তেমনি ভাব-গম্ভীর। লামারা এই মন্দিরের ধূপ সুবাসিত কক্ষের মেঝেতে বসে জাতক পাঠ করছিলেন। শুনতে শুনতে মনের মধ্যে এক পবিত্র ভাব জেগে উঠল। এই নিষিদ্ধ সহর, মন্দির ও অন্যান্য স্থানগুলি দেখতে আমাদের প্রায় চার ঘণ্টা লাগল নেহরু তুনহুয়াম্ গুহার চিত্রাবলী দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। লক্ষ্য করলাম এই ছবিগুলির মধ্যে ভারতীয় প্রভাব খুব সুস্পষ্ট। সবশেষে আমরা 'স্বর্গমন্দির' দেখে ফিরলাম।

* * * *

অবিরাম আলাপ আলোচনা চলেছে আর চলেছে খানাপিনা। কত যে রকমারী খাবার তা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। স্বাদে গন্ধে, বর্ণে যেমন লোভনীয়, ভোজনে ও উপভোগে তেমনি উপাদেয়। অনেক ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হয়েছি, কিন্তু এখানকার ভোজসভার খাদ্যদ্রব্যের কাছে সে সবের কোন তুলনাই হয় না। রান্নাই বা কত রকমের—একজনের পক্ষে খেয়ে শেষ করা অসম্ভব। অন্যান্য দেশের মত এখানকার ভোজসভা দ্রুত লয়ে চলে না। পরিপাটি পরিবেশন, স্বচ্ছন্দ আহার এবং আহারের অবকাশে আলোচনা—সুমধুর গীত-বাদ্যের ভেতর দিয়ে এই রকম সুশৃঙ্খল ভোজসভা জীবনে খুব কম দেখেছি। বলা বাহুল্য, আমাদের প্রধান মন্ত্রী এ জিনিস খুবই উপভোগ করেছেন।

গতকাল চৌ-এন-লাই এক ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। আজ আমাদের পালা। চীনের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মিঃ এন. রাঘবন এক নৈশভোজের আয়োজন করলেন। চীন সাধারণতন্ত্রের চেয়ার-ম্যান মাও-সে-তুং এই ভোজসভায় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর পক্ষে এ একটা স্মরণীয় ব্যতিক্রম, কারণ এই ধরণের সভায় তাঁর উপস্থিতি সত্যই দুর্লভ। ভারতীয় রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্য কামনা করে চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং এশিয়া তথা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় চীন ও ভারতের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা কামনা করেন এবং বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠায় চীনের দৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষণা করেন। এই ভোজসভায় মাও-সে-তুং ছাড়া চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই, ভাইস-প্রেসিডেন্ট চু-তে, মন্ত্রীসভার সদস্যগণ এবং পিকিং-এর বিভিন্ন রাষ্ট্রের দূতগণ সমেত প্রায় চারশো জন নিমন্ত্রিত উপস্থিত ছিলেন।

পাশের একটা দরজা দিয়ে মাও-সে-তুং আচমকা এসে ভোজন কক্ষে প্রবেশ করতেই চারদিক থেকে তুমুল হর্ষধ্বনি' উঠ্‌ল এবং

চীনের জাতীয় সংগীত শুরু হলো। মাও-সে-তুঙের দুই দিকে নেহরু ও রাঘবন্ বসেছিলেন আর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দুই দিকে বসেছিলেন চু-তে এবং লিউ সী-চী। নেহরুর বাঁ দিকে বসেছিলেন চৌ-এন-লাই, অন্যান্য চীনা নেতৃবৃন্দ এবং পাকিস্থানের রাষ্ট্রদূত। মাও সে-তুঙের স্বাস্থ্য কামনা করে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীরাঘবন্ মাওকে "শান্তির অপরাজেয় দূত ও চীনা জনগণের প্রিয় নেতা" বলে অভিহিত করলেন।

ভোজসভায় মাও-সে-তুং-এর সংক্ষিপ্ত ভাষণ তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে অভিনন্দিত হয়। নেহরু মাও-সে-তুংকে একটা জরির মালা উপহার দিলেন। তিনি সেটা কিছুক্ষণ গলায় রাখলেন এবং পরে টেবিলে রেখে দিলেন। তারপর তিনি প্রাণ খোলা হাসি হেসে একটা সিগারেট ধরিয়ে নেহরুর সঙ্গে দোভাষীর সাহায্যে আলোচনায় রত হন। ভারতীয় ভোজসভায় অন্যান্য আহার্যের সঙ্গে ছিল নানা রকম মিষ্টি, চাট্‌নি, পোলাও ও পাঁপড়। ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারীদের গৃহিণীরা এইসব খাদ্য তৈরী ও পরিবেশন করেন। সবশেষে কমলা লেবুর রস পান করার সঙ্গে সঙ্গে ভোজসভার পরিসমাপ্তি ঘটলো। এই নৈশভোজসভায় সবচেয়ে যে জিনিসটি আমার ভাল লাগলো সেটি হলো এই যে, খাদ্য পরিবেশন করবার সময় হাল্‌কা ভারতীয় গান গাওয়া হয়েছিল। ভোজসভার পর নেহরু সদলে একটা চীনা নাটকের অভিনয় দর্শন করেন। এই নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠানে চীনা অর্কেষ্ট্রায় পুরাদস্তুর ভারতীয় সুরে সম্পূর্ণ 'বন্দেমাতরম্' গানটি শুনে আমরা সত্যই মুগ্ধ হয়েছিলাম।

* * * *

প্রধান মন্ত্রীর চীন সফর শুধু যে সরকারী আলাপ-আলোচনা বা আদর-আপ্যায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। নতুন চীনের সব কিছুই নেহরু বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেন। এই ছদিনে তাঁকে চীনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধির সঙ্গে বেশ হৃদ্যতার সঙ্গেই আলোচনা করতে দেখলাম। চীন স্বাধীন হবার পর যে জাতীয় মাইনরিটি ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা দেখে নেহরু আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন ; "আমাদের দেশেও বহু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে।" চুয়াল্লিসটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্ররা ইনষ্টিটিউটে শ্রীনেহরুকে সাদর সম্বর্ধনা জানাল। বর্তমানে ইনষ্টিটিউটের কলেজে ১২০০ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রায় এক হাজার ছাত্র আছে। দেখলাম এখানে ছাত্রদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও চৈনিক ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমান গভর্ণমেণ্ট সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির উন্নয়নে ও তাদের মূল সমাজ জীবনে অঙ্গীভূত করার চেষ্টায় যথেষ্ট উৎসাহ দিয়ে থাকেন।

* * *

দালাই লামার সঙ্গে শ্রীনেহরুর সাক্ষাৎ আর একটি মনে রাখবার মতো ঘটনা। দালাই লামা এই সর্বপ্রথম নেহরুকে দেখলেন এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন। বিস্মিত দালাই লামা আমাদের বললেন—"ভারতের ৬৫ বৎসরের প্রবীণ প্রধান মন্ত্রীকে এত নবীন দেখায় ; এ আমি ভাবতেই পারি নি।" দালাই লামার পরণে ছিল পীত বসন, চোখে চশমা আর আলখাল্লায় আঁটা ছিল তিনটি কলম। নেহরুর সঙ্গে আলাপ শেষ হবার পরই আমরা কয়েকজন রিপোর্টার দালাই লামাকে ঘিরে ধরলাম। কিন্তু মুস্কিল হলো কথা বলতে গিয়ে ; কারণ তিনি তিব্বতী ভাষা ছাড়া কিছু

জানেন না, আর তাঁর দোভাষী চীনা ভাষা ছাড়া কিছু জানেন না। কাজেই ইংরেজী-জানা আরেকজন দোভাষীর দরকার হলো তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে।

দালাই লামা বললেন: "লাসা থেকে পিকিং আসতে তাঁর দেড়মাসেরও বেশী সময় লেগেছে। কিন্তু এখন তিব্বত ও চীনের মধ্যে একটা নতুন রাস্তা তৈরী হচ্ছে। এই রাস্তা সম্পূর্ণ হলে পরে পথের দুর্গমতা যেমন কমবে তেমনি বাড়বে চীন ও তিব্বতের জনসাধারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা।"

"আপনি কবে ফিরে যাবেন?"

"তা এখনও ঠিক বলতে পারিনে। তবে আরো কিছুদিন পিকিং-এ থাকার ইচ্ছে আছে।"

"ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে কেমন দেখলেন?"

"চমৎকার। এই বয়সে এমন তারুণ্য কল্পনাই করতে পারি নে।"

"এখনকার ভারতবর্ষ সম্পর্কে আপনার কি মত?"

"ভারতবর্ষকে আমার পূর্ববর্তী সকল দালাই লামাই শ্রদ্ধা করে এসেছেন। এখনকার ভারতকেও আমরা সমান শ্রদ্ধার চোখেই দেখি।"

* * *

আজ ঠিক চার দিন হলো শ্রীনেহরু চীনে এসেছেন। এই চার দিনে তিনি নয়া চীনের কিছুটা দেখেছেন এবং সরকারী, বে-সরকারী অনেক নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে তাঁর ভাবের আদান-প্রদানও কিছুটা হয়েছে। আমরা ভারতীয় সাংবাদিকেরা ২২শে অক্টোবর সকালে তাঁর বাসভবনে তাঁর সঙ্গে একবার মিলিত হলাম।

প্রথমেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো—"আপনার চীন-ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি ?"

"পারস্পরিক সন্দেহ ও আশঙ্কা যেখানেই থাকুক না কেন, তা দূর করাই আমার চীন সফরের উদ্দেশ্য। মানুষ যাতে স্বাভাবিক ভাবে পরস্পরের সম্মুখীন হতে পারে সেই রকম আবহাওয়াই সৃষ্টি করা দরকার। বর্তমানে এই ধরণের কোনও প্রচেষ্টার অস্তিত্ব আমার চোখে পড়ে নি।"

"আপনি কি এই ব্যাপারে এখান থেকে কোন সাড়া পেলেন ?"

"হ্যাঁ, এই ব্যাপারে এখানকার নেতাদের কাছ থেকে আমি বেশ সাড়া পেয়েছি।"

"চীনের মনোভাব কি রকম বুঝলেন ?"

"বুঝলাম চীনের নেতারা অন্যান্য দেশের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্কই বজায় রাখতে চান। এমন কি যে সব দেশ তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন তাদের সঙ্গেও।"

"এই কদিনের আলাপ আলোচনায় কোনো বিষয়ে মতের ঐক্য খুঁজে পেলেন ?"

"আমরা কোন বিশেষ পরিস্থিতি বা বিশেষ সমস্যায় হাত দিই নি, কাজেই আমাদের মতের ঐক্য বা অনৈক্যের প্রশ্নই ওঠে না। আমরা প্রধানত এশিয়া সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ই আলোচনা করেছি।"

"এ আলোচনার উদ্দেশ্য কি চীনকে অন্যান্য দেশের পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য করে তোলা ?"

"কথাটা অন্যভাবেও বলা যেতে পারে। চীনের কাছে পৃথিবীর অবশিষ্টাংশকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্যেই আমি এই সব আলোচনা খোলাখুলি ভাবে করছি।"

এমন সময়ে আমাদের এক বন্ধু বললেন—"এখানে আসার আগে আমার ধারণা ছিল যে চীনের লোকেরা খুব রূঢ়ভাষী।"

উত্তরে প্রধান মন্ত্রী বললেন—"যেসব বিষয়ের সঙ্গে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সেইসব ক্ষেত্রে তাদের কথা রূঢ় হয়ে দেখা দেয়। চীনারা আত্মাভিমানী জাতি। কেউ তাদের হুমকী দেয়, এ তারা চায়না। তারা বুদ্ধিমান।"

"আপনি কি চীনে কিছু বিক্রয় করতে আসেন নি?"

"না। শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা ছাড়া আমি আর কিছুই কামনা করি না।"

পাঁচ

জনসভায় নেহরু

নেহরুর চীন-ভ্রমণের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখলাম পিকিংয়ের জনসভায় তাঁর বক্তৃতা।

ভারতবর্ষে তাঁর অনেক বক্তৃতা আমি শুনেছি, কিন্তু এত সুন্দর বক্তৃতা খুব কমই শুনেছি।

২৩শে অক্টোবর পিকিং সেণ্ট্রাল পার্কে এই বক্তৃতা হলো। জনসমাবেশ যে খুব বেশী হয়েছিল তা নয়; প্রায় বিশ হাজার নর-নারী এসেছিল ভারতের প্রধান মন্ত্রীর এই বহু প্রত্যাশিত বক্তৃতা শুনবার জন্যে। পিকিংয়ের মেয়র এই সভায় সভাপতিত্ব করলেন। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে শ্রীনেহরু তাঁর বক্তৃতা দিলেন। সমবেত বিপুল জনতা যেন নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে সেই বক্তৃতা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে শুনতে লাগল। জনতার শৃঙ্খলাপ্রিয়তা লক্ষ্য করবার বিষয়। বক্তৃতা মঞ্চের খুব কাছেই রিপোর্টারদের বসবার ব্যবস্থা ছিল, তাই তাঁর এই বক্তৃতার অনুলিখনে আমাদের কিছুমাত্র অসুবিধা হয়নি। বক্তৃতার আরম্ভেই তিনি যখন "পিকিংয়ের প্রিয় জনসাধারণ ও মাননীয় মেয়র" বলে সম্বোধন করলেন, তখন সভায় আর একবার হর্ষধ্বনি উঠ্‌ল। তারপর তিনি বলতে লাগলেন।

"চার দিন আগে আপনাদের এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুপ্রাচীন নগরে প্রথম পদার্পণ করলে আপনারা আমাকে বিপুল সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। এই চার দিন আপনাদের কাছে যে প্রীতি, মৈত্রী ও আতিথেয়তা লাভ করেছি, তা আমাকে বিশেষ ভাবেই অভিভূত করেছে। অন্য দেশ

থেকে আগত কোন মানুষের প্রতি এই যে প্রীতিপূর্ণ সম্বর্ধনা, এর গভীর তাৎপর্য আছে বলে আমার মনে হব। সুদূর অতীতে মানব-ইতিহাসের প্রথম অভ্যুদয়ের দিকে তাকালে দেখতে পাই, যুগ-যুগান্ত ধরে চিন্তা ও সংস্কৃতির অসংখ্য ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে, এই দুটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্য-ঐশ্বর্যের অধিকারী ভারত ও চীন বাইরে থেকে প্রবহমান সে সকল চিন্তা ও সংস্কৃতিকে নিজের জীবনে গ্রহণ করেছে। এ দুটি দেশের পরিবর্তন ঘটেছে অনেক, কিন্তু যুগোপযোগী পরিবর্তনকে আত্মসাৎ করে তারা সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলেছে।

"আজ আবার ইতিহাসের পরিবর্তন ঘট্ছে। দীর্ঘকালের বিস্মৃতির পর আজ তারা আবার বিকশিত হয়ে উঠছে। ভারত ও চীনের এই যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন—এর পটভূমিকায় পার্থক্য সত্ত্বেও, এ এশিয়ার নব জাগরণেরই প্রতীক। এশিয়ার দেশে দেশে যে নতুন প্রাণস্পন্দন, আমাদের দুটি দেশে তাই আজ মূর্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের দুটি দেশ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের সম্মুখে আজ বিপুল সমস্যা রয়েছে। আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে আমরা সে সকল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। বিপুল এই জনসমষ্টির জীবনে সুখ ও শান্তি আনবার উদ্দেশ্য নিয়েই এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশ আজ সাম্নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

"পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেই আমরা বাঁচতে চাই। বিগত কালে আমরা অন্যের হাতে নির্যাতন সহ্য করলেও তাদের বিরুদ্ধে আমরা মনে কোন ক্ষোভের ভাব প্রকাশ করছি না। অবশ্য, এ আশাও আমরা করি যে, তাঁরা আমাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আসবেন না। স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে চীন ও ভারতের অভ্যুদয় এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা লাভের ফলে এই সুপ্রাচীন মহাদেশের রূপ বদলিয়ে গিয়েছে। যে

পুরাণো শক্তিসাম্য একদা এশিয়ায় অন্যের আধিপত্য স্থাপনে সাহায্য করেছিল, তা আজ চিরদিনের মত লুপ্ত হয়েছে। দুঃখ-বেদনা, সমস্যা ও সংকটের ভেতর দিয়ে নতুন এশিয়ায় আজ নতুন শক্তিসাম্য ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

"মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যখন এই বিরাট পরিবর্তন এসেছে, ঠিক তখনই আমরা এক নবযুগের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি। আমি আণবিক শক্তির কথাই বলছি। দুশো বছর আগে শিল্প-বিপ্লব আয়ত্ত হলে পৃথিবীতে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছিল, তার চেয়ে বড়ো এক পরিবর্তন আমাদের জীবন কালেই ঘটে চলেছে। এই বৃহৎ সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বর্তমান যুগের সকল সমস্যার বিচার করতে হবে। প্রচণ্ড আণবিক শক্তি যেমন পৃথিবীকে ধ্বংস করে ফেলতে পারবে, তেমনই এ মানব জাতিকে এমন এক উন্নততর জীবনে পৌঁছিয়ে দিতে পারবে, যা আজ আমরা কল্পনাতেও আনতে পারি নে।

"কাজেই শান্তিপূর্ণ প্রগতি বা যুদ্ধ এই দুইয়ের একটা পথ আমাদের বেছে নিতে হবে। ভাবীকালের যুদ্ধ বিগতকালের যুদ্ধের মতো হবে না—এ যুদ্ধ হবে আরো বীভৎস, আরো বিপজ্জনক, এ মানবসভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে মানবজাতিকে পশুস্তরে নামিয়ে দেবে। তাই আমাদের সাম্‌নে প্রকৃতপক্ষে একটা পথই রয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ এড়িয়ে চলাই যথেষ্ট নয়। যেসব কারণে যুদ্ধ ঘটে, সেগুলো দূর করতে হবে এবং শান্তি ও সদিচ্ছার ভাব বাড়িয়ে তুলতে হবে। ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হিংসা অনেকদিন ধরে পৃথিবীর দিকচক্রবাল আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রার্থনা করি, ভারত ও চীন সংঘর্ষ বিরোধের এই পাপচক্র থেকে বের হয়ে আসুক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার পথে এক নতুন পৃথিবী গঠনে তারা উদ্যোগী হোক, যে-পৃথিবীতে

অন্যের শাসন বা শোষণ থাকবেনা,—শ্রেণীগত বা জাতিগত প্রাধান্য-বর্জিত সে নতুন পৃথিবী প্রতিষ্ঠার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই যেন আমরা অগ্রসর হই। নতুন পৃথিবী গঠনের এই চেষ্টায় আমাদের পদ্ধতি শান্তিপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক হোক, এই আমি কামনা করি।

"চীন তার নিজের ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্বিত—আজ নতুন পাওয়া স্বাধীনতার মধ্যে তারা মনে গভীর আশা ও বিশ্বাস নিয়েই সাম্‌নের দিকে তাকাচ্ছে। ব্যক্তি হিসেবে আমার তেমন কোন মূল্যই হয়ত নেই, কিন্তু নিজের দেশ, নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আমিও আপনাদের মতো গর্বিত। যে আণবিক যুগসন্ধিক্ষণে আমরা দাঁড়িয়েছি, তাতে বিগতকালের কলহ ও বিরোধের কোনই স্থান থাকতে পারে না। এ পৃথিবী ও পৃথিবীর বহু সম্পদকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তবে আমাদের নতুন ভাবে চিন্তা করতে হবে, নতুন পদ্ধতি নিয়ে কাজ করতে হবে।

"শক্তিশালী জাতিগুলি আজ পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে বিরোধ চলছে। মুখে আমরা নিরস্ত্রীকরণের কথা বললেও প্রত্যেকটি বৃহৎ শক্তিই তাদের অস্ত্র-সম্ভার বাড়িয়ে তুলছে, নতুন নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কার করছে। এ নিশ্চয়ই শান্তির পথ নয়। ভবিষ্যতে পূর্ব ও পশ্চিম জগৎকে পরস্পরের সঙ্গে বিরুদ্ধ মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার দ্বারা যে কঠিন সমস্যাবলীর সমাধান হতে পারে, পারে, জেনেভা চুক্তিই তার প্রমাণ। অন্যান্য সমস্যায় এ পদ্ধতি অবলম্বন না করবার কোনই হেতু নেই।

"ভারত ও চীনের প্রধান মন্ত্রী সম্প্রতি তাঁদের নিজের নিজের দেশের পক্ষ থেকে যে পঞ্চনীতি ঘোষণা করেছেন, আমি আশা করি, তা কেবল এশিয়ার জনগণই গ্রহণ করবে না, অন্যান্য দেশ ও

অন্যান্য জাতিও তা গ্রহণ করবে। এ ভাবেই পৃথিবীর শান্তি এলাকা প্রসারিত হবে এবং বর্তমানে যুদ্ধভীতি ও বিরোধের অবসান ঘটবে। আমি আবার বলি, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার একটা উপায়ই আছে। সে উপায় হলো—সহ-অস্তিত্ব, সহযোগিতা ও অন্যের স্বাধীন জীবনযাপনের অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া।

"সবশেষে আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি—শান্তি ও শুভেচ্ছার দূতরূপে আমি এখানে এসেছি। সে শান্তি ও শুভেচ্ছার মনোভাব এখানেও অনেক পরিমাণে দেখতে পেয়েছি। চীন পরিদর্শনের ফলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি সত্যিই আশান্বিত হয়ে উঠেছি। আমার প্রতি, আমার দেশের জনগণের প্রতি, আপনারা যে বন্ধুত্ব ও প্রীতি দেখিয়েছেন, সেজন্যে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্যে চীন, ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতা স্থাপিত হোক—তাদের সকলের চেষ্টা সার্থক হোক—এই আমার বিশেষভাবে বলবার কথা।"

* * *

২৩শে অক্টোবর। প্রজাতন্ত্রী চীনের চেয়ারম্যান মিঃ মাও সে-তুং আজ রাতে ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে এক ভোজে আপ্যায়িত করলেন। বাছাই করা ৩০ জন কমিউনিস্ট নেতা এবং মন্ত্রীগণ এই ভোজসভায় যোগ দিলেন। ভোজের পর শ্রীনেহরু মিঃ মাও সে-তুংয়ের সঙ্গে আলোচনা করেন। এই কদিনে এই দুই নেতা অনেকবার বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। তা ছাড়া ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে চীনের প্রধান মন্ত্রীর অনেক কথাবার্তা হয়েছে; কিন্তু মাও-সে-তুং ও চৌ-এন-লাইএর সঙ্গে আলাপ আলোচনার কোনও খবরই এপর্যন্ত আমরা যোগাড় করতে পারি নি, বা শ্রীনেহরুও

তা কোথাও প্রকাশ করেন নি। আজকের ভোজসভার শেষে একটা সুযোগ পাওয়া গেল। ভোজনপর্ব শেষ হবার পর শ্রীনেহরু যখন মাও-সে-তুঙের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার গৃহে আলোচনা করতে যাবেন, সেই ফাঁকে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হচ্ছে, তার কিছুই অনুমান করতে পারছিনা।"

প্রধান মন্ত্রী একটু হেসে আমার পিঠ চাপড়িয়ে বললেন—"দয়া করে কিছু অনুমান করবেন না। এতই যখন উৎকণ্ঠিত তখন কানে কানে একটা কথা বলি শুনুন। মাও-সে-তুং আমাকে বলেছেন যে, চীনে সোস্যালিজম্ প্রতিষ্ঠা করতে এখনও কুড়ি বছর লাগবে।"

ঠিক এমনি সময়ে লণ্ডন টাইমস্-এর বিশেষ প্রতিনিধি কোথা থেকে আচমকা এসেই প্রধান মন্ত্রীর হাতে তাঁর নামের কার্ডখানা দিয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনার চীন-ভ্রমণের ফল কি?"

"সফর তো এখনও শেষ হয়নি, এর মধ্যে ফলের কথা আসে কোথা থেকে?"

"তবু চার পাঁচদিনে কিছুটা অভিজ্ঞতা তো হয়েছে আপনার।"

"তা হয়েছে বৈ কি! ভারত ও চীন দুটিই পৃথিবীতে অত্যন্ত রোমাঞ্চকর দেশ। ভারতের বিষয়ে আমি যেমন রোমাঞ্চ বোধ করি, তেমনি চীনেও যেসব বিষয় প্রত্যক্ষ করলাম, তাতে রোমাঞ্চ বোধ করলাম। এই আমার চীন সফরের ফল।" এই বলে শ্রীনেহরু মৃদু হেসে চলে গেলেন।

প্রধান মন্ত্রীর "রোমাঞ্চকর"—বিশেষণটি মুহূর্তের জন্য আমার কল্পনাকেও রোমাঞ্চিত করে তুললো।

* * *

এই ভোজসভার আগে, সেন্ট্রাল পার্কের বক্তৃতার পর পিকিংএর মেয়র মিঃ পেং-চেন সর্বশ্রেণীর লোকদের পক্ষ থেকে চুনসুন পার্কের উন্মুক্ত মিউজিক হলে শ্রীনেহরুকে সম্বর্ধনা করলেন। এই সভায় পাঁচ হাজারের বেশী লোক উপস্থিত ছিল। সেন্ট্রাল পার্ক থেকে প্রধান মন্ত্রী মোটরে করে যখন মিউজিক হলে যাচ্ছিলেন, তখন পথের দুই দিকে হাজার হাজার লোক সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল। চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ-এন-লাই প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মেয়র শ্রীনেহরুকে স্বাগত সম্বর্ধনা করে দিল্লীর নাগরিকদের এবং ভারতের অধিবাসীদের প্রতি পিকিং-এর জনসাধারণের শুভেচ্ছা জানালেন। তারপর শ্রীনেহরুকে ভারত-চীন মৈত্রী ও বিশ্বশান্তি প্রকাশক সূঁচের কারুকার্যকরা একটি রেশমী পতাকা, একটি টেবিল ল্যাম্প এবং চীনামাটির দুটি সুন্দর পুষ্পাধার উপহার দেওয়া হলো।

* * *

রাত্রে হোটেলে বসে ডেসপ্যাচ তৈরী করলাম। আজকের দিনের খবর যা, সে তো আগেই টেলিগ্রাম করা হয়ে গেছে। এখন যেটা লিখছি সেটা হলো সংবাদের ভাষ্য। পিকিং-এর জনসভায় শ্রীনেহরুর বক্তৃতা, সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা, চীনা রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা এই সবের ভেতর দিয়ে প্রধান মন্ত্রীর চীন-ভ্রমণের সফলতার কথাই সকলের আগে মনে পড়লো। এখানে তিনি যে স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনা পেলেন, শুনলাম এর আগে আর কোনো বিদেশী রাষ্ট্রনায়কের সে সৌভাগ্য হয়নি। দিগ্বিজয়ীর উদ্ধত মহিমা নিয়ে শ্রীনেহরু চীনের জনসাধারণের চিত্ত জয় করতে আসেন নি—এসেছেন তিনি শান্তি ও শুভেচ্ছার দূত

হয়ে। তাঁর ভাষণ ও ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার ভেতর দিয়ে তাঁর কণ্ঠে সেই শান্তি ও শুভেচ্ছার ললিত বাণীই বারবার ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু এই ত তাঁর সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি নয়।

"বাইরের পৃথিবীর কাছে তিনি চীনকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করতে চেষ্টা করছেন কিনা"—সাংবাদিক বৈঠকে এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতের প্রধান মন্ত্রী যখন উত্তর দিলেন—"আমি বরং চেষ্টা করছি বাইরের পৃথিবীকে চীনের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করতে" —তখনই বুঝলাম শ্রীনেহরুর রাজনৈতিক প্রতিভা কত তীক্ষ্ণ ও অসামান্য। পাছে এই অদ্ভুত প্রশ্ন ও তার জবাবের দ্বারা চৈনিক জনসাধারণের আত্মমর্যাদা আহত হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি প্রশ্নটিকে ঘুরিয়ে দিলেন। তবু, আমার মনে হলো, এই প্রশ্ন ও উত্তরের অন্তরালে একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়ে গেছে। ডেসপ্যাচে সেই তাৎপর্যটা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করলাম।

প্রশ্ন যেভাবেই করা হোক আর তার যে উত্তরই পণ্ডিতজী দিন না কেন—মূল কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, চীন এতদিন বাইরের পৃথিবী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ রেখে ছিল তার স্বগৃহের চতুঃসীমার ভেতরে, তার বিচরণসীমা ছিল বড় জোর প্রতিবেশী কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের সংলগ্ন প্রাঙ্গন অবধি; সে বাইরের পৃথিবীকে দেখত নিজের ঘরের জানালায় বসে এবং তা দেখত নিজেকে এমন সন্তর্পণে আড়ালে রেখে যাতে বাইরের পৃথিবী তার পরিপূর্ণ রূপ দেখতে না পায়। দৃষ্টির পক্ষে দুর্ভেদ্য এই আড়াল চীনকে যতখানি অচেনা রেখেছে পৃথিবীর সমাজের কাছে, চীনের গতিবিধি উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে বাইরের পৃথিবীর মনে শঙ্কা ও সংশয়ের সঞ্চার করেছে ঠিক সেই অনুপাতে। পণ্ডিত নেহরু যদি সেই ব্যবধান বিদূরিত করে চীনকে উন্মুক্ত করে দিতে পারেন

বাইরের পৃথিবীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সাম্‌নে তাহলে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে না হোক, অন্ততঃ এশিয়ার জাতি সমাজের সঙ্গে স্থাপিত হবে চীনের সহজ, স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ। বিশ্ব পরিচিতির পথে এই হবে তার প্রথম পাদবিক্ষেপ। চীন যে সে পথে পা বাড়াবার জন্যে উদ্যত তা প্রমাণিত হয়েছে চৌ-এন-লাইএর ভারতে আসায়, বৃটিশ শ্রমিক দলের প্রতিনিধিগণের সাম্প্রতিক চীন পরিদর্শনে আর ভারত থেকে আমন্ত্রিত বিভিন্ন প্রকারের প্রতিনিধিদলের জন্য চীনের প্রবেশপথ সম্পূর্ণরূপে অর্গলমুক্ত করার ঘটনার দ্বারা। চীনের পাষাণ প্রাচীরকে ঘিরে যে বৃহত্তর যবনিকা এতদিন বিলম্বিত হয়েছিল, মনে হচ্ছে, শ্রীনেহরুর চীন ভ্রমণের ফলে তা ধীরে ধীরে উত্তোলিত হচ্ছে চীনের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চের ওপর থেকে।

ছয়

মুকদেন-মাঞ্চুরিয়া-দাইরেন

২৪শে অক্টোবর।

এবার আমাদের চীনের উত্তর-পূর্বে যাবার পালা। আজ সকালে আমরা প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে পিকিং থেকে বিমান যোগে মুকদেনে এলাম। মুকদেনে এসে প্রচণ্ড শীতের আভাষ পাওয়া গেল। কালো লাউঞ্জ স্যুটের ওপর একটা প্রচণ্ড ওভারকোট চাপিয়ে শ্রীনেহরু বিমান থেকে নামলেন। সঙ্গে ছিলেন কন্যা ইন্দিরা, শ্রীএন. আর. পিল্লাই, শ্রীরাঘবন ও উচ্চপদস্থ চীনা কর্মচারীবৃন্দ। আমরা রিপোর্টাররা অবশ্য এক ঘণ্টা আগে অন্য প্লেনে এখানে পৌঁছে গেছি। বিমানঘাঁটিতে স্থানীয় অফিসারগণ, রাশিয়ার কনসাল জেনারেল এবং উত্তর কোরিয়ার সরকারের প্রতিনিধিগণ শ্রীনেহরুকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। মুকদেনে এখনও বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্মৃতি—বোমাবিধ্বস্ত বহু অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ—বর্তমান।

মুকদেনে একটা আদর্শ পল্লী আছে। এর কথা ভারতের প্রধান মন্ত্রী অনেক দিন থেকেই শুনেছেন এবং এটা দেখবার জন্যে তাঁর আগ্রহও ছিল খুব। শুনলাম বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে যাঁরাই এই আদর্শ পল্লীর যৌথ খামার ব্যবস্থা দেখে গেছেন, তাঁরাই এর অকুণ্ঠ প্রশংসা করে গেছেন। চীনের মুক্তিসাধনের পর জমিদারদের কাছ থেকে জমি হস্তগত করে কৃষকদের মধ্যে কিভাবে ঐ জমি বণ্টন করা হয়েছে তা গ্রামের প্রধান শ্রীনেহরুকে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন: "এরপর থেকেই ফসলের উৎপাদন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে।"

"চাষীদের জন্যে আর কি ব্যবস্থা আছে?" জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীনেহরু।

"যৌথ খামারে চাষীদের জন্যে আমরা শিশুবিদ্যালয় প্রভৃতি জনকল্যাণকর কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও পরিচালনা করে থাকি।"

"প্রত্যেক চাষীকে কি পরিমাণ জমি দেওয়া হয়?"

"যার যতটুকু প্রয়োজন তাকে ততটুকু জমি দেওয়া হয়।"

"চাষের জন্যে আর কি কি দেওয়া হয়?"

"উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রভৃতি প্রত্যেক চাষীকে ন্যায্য দামে সরবরাহ করা হয়।"

"ফসল কিভাবে কেনা-বেচা হয়?"

"সমবায় পদ্ধতিতে।"

* * * *

আদর্শ গ্রাম পরিদর্শন করার পর শ্রীনেহরু ট্রেনযোগে মাঞ্চুরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ইস্পাত উৎপাদন-কেন্দ্র আনশান অভিমুখে রওনা হলেন। একখানা স্পেশাল ট্রেনে আমরা তার আগেই রওনা হলাম। উত্তর-পূর্ব চীনে এইটাই হলো বৃহত্তম ইস্পাত-উৎপাদন কেন্দ্র। সম্ভবত আনসানের ইস্পাত কারখানাটি দেখে শ্রীনেহরুর জামসেদপুরের কথা মনে পড়ে থাকবে। আজ রাতেই প্রধান মন্ত্রী এখান থেকে দাইরেন (পোর্ট আর্থার) গিয়ে জাহাজ তৈরীর কারখানা দেখবেন এবং কাল বিকেলেই আবার মুকদেনে ফিরে আসবেন। মুকদেনে এখনও অনেক কিছু দেখার বাকী আছে। এই মুকদেনই হলো চীনের শিল্প-নগরী।

* * * *

২৫শে অক্টোবর।

চীনের উত্তর-পূর্ব কূলে দাইরেন একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। এ পর্যন্ত বিদেশের খুব কম লোককেই এই বন্দরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছে। অতি সুন্দর এই বন্দর-নগরী। পোর্ট আর্থার থেকে প্রায় ৩০ মাইল দূরে দাইরেন বন্দর অবস্থিত। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে

দাইরেন অনেকবার হাত বদল হয়েছে। পোর্ট আর্থারে রুশদের একটা নৌ-ঘাঁটি রয়েছে দেখলাম। দাইরেন বহুবার রাশিয়া ও জাপানের দখলে ছিল কিন্তু গত মহাযুদ্ধের পর এই বন্দর রাশিয়ার কাছ থেকে চীনাদের অধীকারে আসে। শুনলাম এই অক্টোবর মাসে রাশিয়ার সঙ্গে চীনের একটা চুক্তি হয়েছে যার ফলে আগামী বৎসর মে মাসে পোর্ট আর্থারের কর্তৃত্বভার চীনাদের হাতে অর্পণ করা হবে।

পোর্ট আর্থার জাপানীদের দখলে ছিল চল্লিশ বছর ধরে। ১৯৪৬ সালে এটা রাশিয়ার হাতে আসে। জাপানের স্মৃতি পোর্ট আর্থারের চারদিকে এখনও কিছু কিছু আছে এবং সেই সঙ্গে রাশিয়ার চিহ্নও বর্তমান। পাবলিক নোটিশগুলি সব রুশ ভাষায় লেখা। প্রকাণ্ড একটা সরকারী হোটেলে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল এখানে। এক রাত্রি ট্রেন ভ্রমণের পর আজ সকালে আমরা এখানে পৌঁছলাম। প্রত্যূষেই প্রাতরাশ সমাধা হলো। প্রচুর পরিমাণে ব্রাউন কেভিয়ারের সঙ্গে সিদ্ধ গলদা চিংড়ী মুখরোচকই লাগল। দেখলাম রাস্তায় কয়েকটি রুশ সৈনিক ইতস্ততঃ বেড়াচ্ছে।

প্রাতরাশ শেষ করে প্রধান মন্ত্রী তাঁর দিনের কর্মতালিকা শুরু করলেন স্থানীয় জাহাজ তৈরীর কারখানা পরিদর্শন দিয়ে। এটি রুশ ও চীনাদের যৌথ উদ্যোগ। জনৈক রুশ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীনেহরুকে জাহাজ নির্মাণ কারখানায় রুশিয়ার নির্মিত আধুনিক যন্ত্রপাতি দেখালেন। আগামী বৎসরে রুশিয়া সমগ্র কারখানাটি চীনাদের হাতে দিয়ে দেবে। দেখলাম বর্তমানে খুব কম রুশই কারখানায় রয়েছে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী-জেনারেল শ্রীএন আর পিল্লাই (ইনি হিন্দুস্থান শিপ্-বিল্ডিং ইয়ার্ডের চেয়ারম্যান) জাহাজ নির্মাণ কার-

খানাটি গভীর আগ্রহের সঙ্গে পরিদর্শন করলেন। বিশাখাপত্তনমের মত এখানে মহাসাগরে চলাচলের উপযোগী জাহাজ তৈরী হয় না। ছোট ছোট জাহাজ ও ষ্টীমার তৈরী হয়ে থাকে। অকমিউনিষ্ট কোনো বিদেশীকে দাইরেন বন্দরের এই কারখানা দেখতে দেওয়া হয় না—এই জানতাম। আজ ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গী হওয়ার ফলে কারখানার ভেতরে আমাদের গতিবিধি শুধু অবাধ নয়, ইচ্ছামত ফটো তোলাতেও কোন বাধা নেই। এমন কি কারখানার কর্ম-চারীদের সঙ্গেও আমরা নিঃসংঙ্কোচে আলাপ করলাম। কারিগরদের মধ্যে অনেক মহিলা-কারিগরও দেখলাম। কারখানার দেয়ালে রঙীন কালিতে লেখা অনেক রকমের শ্লোগান চোখে পড়লো। এইগুলির উদ্দেশ্য শ্রমিকদের উৎসাহ দেওয়া। একটি শ্লোগানে লেখা ছিল—"ফরমোজার মুক্তির জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি কর।" কারখানার ভিতরে-বাইরে বহু রঙীন পতাকা বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছিল। সেসব পতাকায় লেখা ছিল "ভারত-চীন মৈত্রী স্থায়ী হোক্।"

এর পরে আমরা দেখতে গেলাম এখানকার ইঞ্জিন ও রেলগাড়ি উৎপাদনের কারখানা। দাইরেনের ওয়াগন তৈরীর ফ্যাক্টরীটি দেখে প্রধান মন্ত্রী খুব সন্তোষ প্রকাশ করলেন। পরিদর্শনের পর আমরা এলাম বিশ্রাম কক্ষে। সেখানে টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত রয়েছে নানাবিধ রুশ পানীয়—মদ আর স্যাম্পেন। অপর একটি কক্ষে কারখানার রুশ ম্যানেজার ভারতের প্রধান মন্ত্রীর স্বাস্থ্য কামনা করলেন। এই কদিন দেখলাম বড় একটা কোনো ব্যাপারে চীনাদের রীতিই হলো বিদেশ থেকে আগত অতিথির স্বাস্থ্য কামনা করা। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা একটি কাচের কারখানা ও একটি শিল্প মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। কাচের কারখানাটি

একটি মহিলার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। তিনি এবং তাঁর সহকর্মিণীরা উৎসাহের সঙ্গে আমাদের সব দেখাতে লাগলেন।

আজ রাতেই আমরা পিকিং হয়ে মুকদেনে ফিরব।

* * *

দাইরেন বন্দর পরিদর্শন করবার সময় ভারত থেকে এক অপ্রত্যাশিত মর্মান্তিক শোকাবার্তা এসে পৌঁছলো শ্রীনেহরুর কাছে। কারখানা ও জাহাজ-নির্মাণস্থল দেখে তিনি যখন অতিথি-ভবনে ফিরে আসেন, তখন তাঁর হাতে একখানা টেলিগ্রাম দেওয়া হয়। ঐ টেলিগ্রামে ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ সহকর্মী, ভারত সরকারের কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রী শ্রীরফি আমেদ কিদোয়াইয়ের দিল্লীতে আকস্মিক মৃত্যুর খবর। টেলিগ্রামখানা পড়ে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। এই আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে শ্রীনেহরু অত্যন্ত মর্মাহত ও অভিভূত হন। হাতের মধ্যে মুখ রেখে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে তিনি একটি সোফার ওপর বসে পড়েন; অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও তিনি বলতে পারেন নি। তাঁর সমস্ত মুখ পাণ্ডুর হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদে আমরা সকলেই শোকাভিভূত হলাম। কিছুক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করে শ্রীনেহরু ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারীর কাছে একটা সংক্ষিপ্ত তারবার্তা পাঠালেন। তাতে তিনি নির্দেশ দিলেন—পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে কিদোয়াইয়ের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানের যেন সব ব্যবস্থা হয়। তারপর প্রধান মন্ত্রীর দপ্তর থেকে একটা বিবৃতি প্রচারিত হলো। সেই বিবৃতিতে শ্রীনেহরু বললেন; "ব্যক্তিগত এবং জাতিগত দুই দিক থেকেই শ্রীরফি আমেদ কিদোয়াইয়ের মৃত্যুতে যে ক্ষতি হলো, তা আমার পক্ষে বহন করা কঠিন। তাঁর সম্বন্ধে এর বেশী কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও

পরবর্তীকালে মন্ত্রীসভার সদস্যরূপে সুদিনে দুর্দিনে নিবিড়তম বান্ধবতার মধ্যে আমরা ৩৫ বৎসর একসঙ্গে কাজ করেছি। পুরাতন বন্ধুর মৃত্যু সবারই মনকে বেদনায় ও নিঃসঙ্গতাবোধে পীড়িত করে তোলে। কিন্তু শ্রীকিদোয়াইয়ের মৃত্যু তার চেয়েও দুঃসহ আঘাত। দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তিনি দেশের যে সেবা করেছেন, তা কৃতিত্বে ও নিষ্ঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।”

এরপর তিনি রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছে ও শ্রীমতী কিদোয়াইয়ের কাছে দুটি বিভিন্ন শোকবার্তা পাঠিয়ে দিলেন। চীন থেকে বিদায়-গ্রহণ উপলক্ষ্যে আগামীকাল পিকিংয়ে চীনা নেতাদের যে নৈশভোজে আপ্যায়িত করার আয়োজন হয়েছিল পরলোকগত সহকর্মীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্যে শ্রীনেহরু তা বাতিল করে দিলেন। পিকিংয়ের ভারতীয় দূতাবাসে ভারতীয় পতাকা অর্ধনমিত হলো ও দেওয়ালীর আমোদ উৎসবও বাতিল করে দেওয়া হলো।

সাত

বিদায়ের পূর্বে

২৬শে অক্টোবর।

মাঞ্চুরিয়াতে সেন ইয়াং, আনশান ও দাইরেন বন্দর দেখে আমরা পিকিংয়ে ফিরে এলাম। এবার বিদায়ের পালা। তার আগে আমরা প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হলাম। এই সাংবাদিক বৈঠকেই শ্রীনেহরু সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে বললেন; "চীনের প্রধান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ চৌ এন-লাইয়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় তাঁর অনেকাংশে মতৈক্য হয়েছে। কোন কোন দেশের সংবাদপত্রে আমাদের মধ্যে তীব্র মতভেদের যে সংবাদ বেরিয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কোন কোন ব্যাপারে ভারতের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে চীনের দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুটা পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে কোন মত-বিরোধ ঘটেনি।"

আমরা প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। পিকিংয়ে এ ধরণের বৈঠক এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। এই সাংবাদিকদের মধ্যে প্রায় সকল দেশের রিপোর্টাররা উপস্থিত ছিলেন। চীন, বৃটেন, ফ্রান্স, ভিয়েৎনাম, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর কোরিয়া এবং ভারত প্রভৃতি দেশের সাংবাদিকরা এই বৈঠকে মিলিত হন প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে। আলোক-উজ্জ্বল সুপরিসর কক্ষ, সারি সারি ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। ক্যামেরার ফ্ল্যাস বাল্‌ব জ্বলে উঠ্‌ছে; দোভাষীরা বসে আছেন শ্রীনেহরুর দুই দিকে। যার যা খুশি প্রশ্ন করছেন, পরম কৌতুকের সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী উত্তর দিয়ে চলেছেন।

কৌতুক মিশ্রিত হলেও প্রত্যেকটি উত্তরের প্রতিটি বাক্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচিত। প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হওয়া অবশ্য এই আমার প্রথম নয়। দিল্লী ও পিকিংয়ের সাংবাদিক বৈঠকের মধ্যে পার্থক্যটাও নজরে পড়লো। বিলম্বিত লয়ের এই বৈঠকে দিল্লীর বৈঠকের সে ঔজ্জ্বল্য বা তীক্ষ্ণতা ছিল না। পরিবেশ ঘরোয়া হলেও, প্রধান মন্ত্রীকে দিল্লীর মতো প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে দেখা গেল না।

চীনা সাংবাদিকগণের প্রশ্নগুলি ছিল ভারত-চীন সহযোগিতা, শান্তি এলাকা সম্প্রাসরণ, কোরিয়া ও চীন সম্পর্কে শ্রীনেহরুর ধারণা—এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে। এইসব বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তরের ভেতর দিয়ে প্রধান মন্ত্রীর সমগ্র বক্তব্যের সারাংশ এইভাবে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

* * *

"আমার বিশ্বাস আমার চীন-ভ্রমণের ফলে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক শুধু ঘনিষ্ঠতরই হবে না, তা বিশ্বশান্তির পক্ষেও সহায়ক হবে। ভারত ও চীন দুই-ই শান্তিকামী; কারণ উন্নতির মূল ভিত্তি আমাদের উভয়েরই কাম্য। এ শুধু নিছক সদিচ্ছার কথা নয়, এ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যকও বটে। আবার কোন কোন ব্যাপারে আমাদের উভয়ের সমস্যা একই রকমের এবং উভয়কে একই জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমরা একে অন্যের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারি।

"চীন ও ভারতের অভিপ্রায় এই যে দুই দেশের কোটি কোটি লোক আমাদের সমৃদ্ধির অংশভাগী হোক। আমি আশা করি আমাদের দুই দেশের মধ্যে অনেক রকমের সম্পর্ক গড়ে উঠবে। আমরা একে অন্যকে জানব, এ খুবই বড় কথা। আধুনিক জগতে

যে কোন দেশের পক্ষে বিচ্ছিন্ন থাকাটা নিতান্তই সামঞ্জস্যহীন। যাতে অবাধে মেলামেশা চলতে পারে, সেজন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে অন্তরায় দূর করতেই হবে। তেমন অবস্থায় এক জাতি অন্য জাতিকে আরো ভালো করে বুঝতে পারবে এবং একের সম্পর্কে অন্যের গভীরতর জ্ঞানলাভ হবে। এই উদ্দেশ্যে আমরা ভারত-বাসীরা শুধু চীনকেই নয়, অন্যান্য দেশকেও সাহায্য করতে প্রস্তুত।

"আমাকে ফরমোজার কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে ভারত এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অক্ষম। চীনের গণসরকারকে আমরা স্বীকার করি, অন্য কোন সরকারকে স্বীকার করি না। তবে আমি আশা করি যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই সমস্যার মীমাংসা হবে। স্বাধীন হবার পরেও ভারতে কয়েকটি ফরাসী উপনিবেশ ছিল। আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়েই এ সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছি। ভারত-ফ্রান্স চুক্তির কথা আপনারা শুনে থাকবেন।

"কোরিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। জেনেভা বৈঠকের পরই এই বিষয়ের সমাপ্তি ঘটেছে বলে আমাদের মনে করা অনুচিত। এখনও এ সম্পর্কে আলোচনা চলা উচিত। তাহলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আরো আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হবে এবং এইভাবে মীমাংসার ভিত্তি উদ্ভাবিত হবে। আপনারা জানেন মতের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মীমাংসার জন্যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিরা জেনেভাতে মিলিত হয়েছিলেন। জেনেভা-সম্মেলন এই রকম আপোষ-মীমাংসার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। এই বৈঠকে আপোষ-আলোচনার সার্থকতা বোঝা গেল, কিন্তু এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রতিরক্ষা সংস্থা ও সেই রকম অন্যান্য সংস্থার

মূলে রয়েছে আতঙ্ক স্থষ্টিকারী সামরিক অবরোধের অভিপ্রায় ও আশঙ্কা।

"আমি বিশ্বাস করি যে, আমার চীন-পরিদর্শনের ফলে ভারত ও চীনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে স্থাপিত হবে এবং বিশ্ব-শান্তির পক্ষেও এ সহায়ক হবে। চীন এবং ভারত শান্তির ভিত্তিতে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে চায়। আজকের দিনে পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হলো শান্তি। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, চীন ও ভারত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবেই।"

* * *

আজ বিকেলে পিকিং-এর মেয়র মিঃ পেন্-চেন্ শ্রীনেহরুকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্যে এক ককটেল পার্টির আয়োজন করেন। এই সম্বর্ধনা সভায় শ্রীনেহরু, কন্যা ইন্দিরা, শ্রী এন, আর পিল্লাই ও তাঁর দলের অন্যান্য সহচরসহ যোগ দেন। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীরাঘবন্ ও ভারতীয় দূতাবাসের অপরাপর সদস্যগণও উপস্থিত ছিলেন। চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ-এন-লাই, তিব্বতের দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামা, ভারতস্থ চীনা রাষ্ট্রদূত প্রমুখ সাতশো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমরা যে ছিলাম, সে কথা উল্লেখ করা বাহুল্য।

এই ককটেল পার্টির আগে ভারতের প্রধান মন্ত্রী চীনা রাষ্ট্র-প্রধান মিঃ মাও-সে-তুঙের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিদায় গ্রহণ করেন। দুই রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে বিদায়ের প্রাক্কালে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল আলাপ-আলোচনা হয়।

* * *

একটা বড় খবর শুনলাম।

পিকি-এ ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর আলোচনার ফলে

ভারত ও চীনের মধ্যে বিমান চলাচল সম্পর্কে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পারস্পরিক ভিত্তিতে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই চুক্তির সর্ত অনুযায়ী চীন ভারত পর্যন্ত বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনালের বিমানগুলি বর্তমানে হংকং পর্যন্ত যায়। ঐ সব বিমান এর পর থেকে ক্যান্টন পর্যন্ত যাবে।

* * *

পিকিং বেতারে বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় এক বিশেষ সংবাদ। সেই সংবাদে বলা হলো যে, বিদায়ের প্রাক্কালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপ্রধান মিঃ মাও-সে-তুঙের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও প্রায় দেড়ঘন্টাকাল তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। আগামী কাল ২৭শে অক্টোবর, বুধবার সকালে বিদায়ের পূর্বে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পিকিং বেতারে বক্তৃতা করবেন।

তখনি ভাবলাম বেতারে তাঁর এই ভাষণ নিশ্চয়ই দিল্লী বেতার-কেন্দ্র থেকে সারা ভারতে রীলে করা হবে এবং সেখানে অগণিত ভারতবাসী চীন পরিভ্রমণরত তাদের প্রিয় প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ শুনবার জন্যে নিশ্চয়ই অধীর আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করবে।

* * *

আজ রাতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী এক বিদায় ভোজে চীনের রাষ্ট্রনায়কদের আপ্যায়িত করলেন। প্রায় আটশো অতিথিকে এই ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। এই ভোজ সভাটি আমরা বিশেষভাবে উপভোগ করলাম। চীন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান একটি পুরাতন চীনা কবিতা আবৃত্তি করে ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে বিদায় জানালেন। কবিতাটির ভাবার্থ হচ্ছে : "বিদায়ের বেদনা অসহনীয়,

নূতন পরিচয়ের আনন্দ অনির্বচনীয়।” তারপর চীনা প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই বললেন, “চেয়ারম্যান চীনের জনগণের মনের কথাটাই সঠিকভাবে প্রকাশ করেছেন। যদিও বিদায়ের বেদনা আছে, কিন্তু আমি আবার নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।”

তারপর শ্রীনেহরু বললেন, “এখানে কয়েকদিন থাকার সময়ে আমার প্রতি যে প্রীতি ও আতিথেয়তা দেখান হয়েছে, সেজন্যে চীনের জনগণ ও গভর্ণমেন্টের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। চেয়ারম্যান মাও সে-তুং একজন নির্ভীক যোদ্ধা, বিপ্লবী নায়ক ও প্রতিভাশালী সংগঠক। এখন আমরা তাঁকে এক সুমহান শান্তি-প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে দেখতে চাই।”

চেয়ারম্যন মাও-সে-তুঙের স্বাস্থ্য কামনা করে ভারতের প্রধান মন্ত্রী বললেন, “আজ পিকিং থেকে বিদায় নেবার সময় আমার অন্তর আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। আজ ভারতে এক বড় রকমের উৎসবের দিন। দীপাবলী উৎসবে ভারতের প্রতিটি গৃহ আলোক-মালায় সজ্জিত হয়ে ওঠে; কিন্তু দুঃখের বিষয় একটি শোকাবহ ঘটনার ফলে সে উৎসব ম্লান হয়ে গেছে। চীনে এসে দেখলাম, এক প্রাণবন্ত জাতি এক বিরাট কর্তব্যের দায়িত্ব নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তারা যে জয়ী হবে, সে বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মহাচীনের জননায়ক মাও-সেতুঙের প্রতি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানাই।”

পরিশেষে মাদাম সান-ইয়াৎ সেন বিশ্বশান্তি ও ভারত-চীন মৈত্রী কামনা করলেন।

* * *

২৭শে অক্টোবর।

পিকিং থেকে যাত্রা করবার আগে এক বেতার ভাষণে শ্রীনেহরু

বললেন ; "বিশ বছর আগে চীনে এক সুদীর্ঘ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি ঐসব সংবাদ পাঠ করতাম। যে যোগ্যতা ও ধৈর্যের সঙ্গে এই অভিযান পরিচালিত হয়েছে তা সামরিক ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা হয়ে রয়েছে। আমার কাছে এই সংগ্রাম জাতি ও জনগণের সুদীর্ঘ অভিযানের প্রতীকস্বরূপ। স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির জন্যে ভারত ও চীন অনেক দিন ধরে সংগ্রাম করে আসছে। নতুন চীন দেখে আমার যেসব ধারণা হয়েছে তা আমি সঙ্গে করে ভারতে বহন করে নিয়ে যাব। চীনের জনগণ আমার প্রতি যে সৌজন্য ও আতিথেয়তা দেখিয়েছেন, তার স্মৃতিটুকুও আমি বহন করে নিয়ে যাব। এই রম্য শহর রাজধানী পিকিং-এর কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। আমরা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি, যখন আমাদের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে কাজ করে যেতে হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণ সমৃদ্ধি, সুখ ও স্বাস্থ্য লাভ না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে। অতএব দুই দেশই এই মহান কাজে লিপ্ত আছে। উভয়ে উভয়ের কাছে কিছু না কিছু শিক্ষালাভ করতে পারে বলে আমি মনে করি।"

* * *

চীন ও ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে, চৌ-এন-লাই প্রমুখ সকলের সপ্রীতি অভিনন্দনের ভেতর প্রধান মন্ত্রী রাজধানী পিকিং থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। আমরাও তাঁর অনুসরণ করলাম।

আট

পিকিং থেকে সাংহাই

২৭শে অক্টোবর।

প্রধান মন্ত্রীর চীন-ভ্রমণের প্রথম পর্যায় শেষ হলো। এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের ভ্রমণ শুরু হলো। এই পর্য্যায়ের তালিকায় আছে সাংহাই, হ্যাংকাও, নানকিং ও ক্যান্টন। পিকিং থেকে আমরা প্রথমে এলাম নানকিং। সকালে পিকিং বিমানঘাঁটিতে প্রধান মন্ত্রীকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ-এন-লাই, চীনের কয়েকজন মন্ত্রী ও পিকিং-এর ভারতীয়গণ। বিমানে আরোহণ করবার সময় শ্রীনেহরু তাঁর বিদায় বাণীতে বললেন: "আমি পিকিং এবং উত্তর চীনের জনগণের সহৃদয় আতিথ্যের স্মৃতি নিয়ে বিদায় গ্রহণ করছি। আমাকে যে সম্বর্ধনা জানান হয়েছে, তা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। এই সম্বর্ধনা ছুটি বিরাট রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের প্রতীক। আমাকে উপলক্ষ্য করে ভারতের জনগণের প্রতি যে বন্ধুত্বের মনোভাব দেখান হয়েছে, ভারতের জনগণ তা কোনদিনই বিস্মৃত হবে না।"

প্লেন ছাড়বার সময় একদল সৈন্য সামরিক কায়দায় প্রধান মন্ত্রীকে বিদায় অভিনন্দন জানাল।

দুপুরে আমরা নানকিং এসে পৌঁছলাম। বিমানযোগে আসবার সময় প্রধান মন্ত্রী চীনের হুয়াই নদীর বাঁধ ও চীনের বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলগুলি দেখার সুযোগ পান। শুনলাম্ এই বছর বন্যার আক্রমণে এই অঞ্চলের ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। বিমান থেকে বিচ্ছিন্ন ও আধ-ডোবা পল্লীগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। নানকিংয়ে

তিন ঘণ্টা থাকবার পর আজ সন্ধ্যায় প্রধান মন্ত্রী সাংহাই এসে পৌঁছলেন। সাংহাই নগরীর জনগণ তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানাল।

পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শহর এই সাংহাই। দেখলাম বিমান-ঘাঁটিতে শ্রীনেহরুকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে প্রায় এক লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল। বিমান থেকে নামতেই সমবেত বিরাট জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠ্‌লো। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে পুষ্পস্তবক আন্দোলিত করতে লাগল। যে পথ দিয়ে প্রধান মন্ত্রী শহরে প্রবেশ করলেন, তার দুই দিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অসংখ্য নরনারী তাঁকে অভিনন্দিত করে। সন্ধ্যায় সাংহাইয়ের মেয়র শ্রীনেহরুর সম্মানার্থ এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। দু'হাজারের বেশী এই ভোজ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

* * *

পিকিং-এ প্রধান মন্ত্রীর সম্বর্ধনা দেখেছি, সাংহাইতেও দেখলাম। এখানকার আয়োজন তুলনায় ছোট হলেও, পিকিংয়ের চেয়ে তা যে বর্ণাঢ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শহরের যেখানে যত ফুল ছিল তাই দিয়ে রচিত হয়েছিল অজস্র পুষ্পস্তবক মাননীয় অতিথির সম্বর্ধনার জন্যে। বেশীর ভাগই দেখলাম ডালিয়া। বিমানঘাঁটিতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীউমা নেহরুর নেতৃত্বাধীনে চীনে ভ্রাম্যমাণ ভারতীয় প্রতিনিধিদল আর স্থানীয় শিখ অধিবাসীগণ। নানকিংয়ে যে তিন ঘণ্টা প্রধান মন্ত্রী বিশ্রাম করেন সেই অবসরে তিনি মোটরে করে নব্যচীনের স্রস্টা সান-ইয়াৎ-সেনের অপরূপ সুন্দর স্মৃতিসৌধটি পরিদর্শন করেন। "রেড এ্যাণ্ড পার্পল হিলস্"-এর উপর স্মৃতিসৌধটি অবস্থিত। প্রধান মন্ত্রী পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে সৌধমূলে ডালিয়া ফুলের তৈরী একটা বিরাট মালা দান করেন। ৩৪৯টি সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে সৌধমূলে উপনীত হতে হয়।

প্রধান মন্ত্রীর যে চিকিৎসক তাঁর সঙ্গে দিল্লী থেকে এসেছেন, তাঁর বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনেই শ্রীনেহরু অবলীলাক্রমে এবং তারুণ্যসুলভ ক্ষিপ্র গতিতে একটার পর একটা সোপান অতিক্রম করে সোধমূলে পৌছলেন। সৌধের পিছনে বেগুনী ও রক্তবর্ণ সেই পর্বতের মনোহর সৌন্দর্য দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। প্রকৃতির এই রম্য স্থানে তিনি হয়ত আরো কিছুক্ষণ থাকতেন, কিন্তু তখনও আরো কয়েকটা দ্রষ্টব্য স্থান দেখবার বাকী ছিল।

* * *

রাত্রে সাংহাইয়ের মেয়রের ভোজসভায় প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আমরাও আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলাম। শ্রীনেহরুর স্বাস্থ্য কামনা করে সহকারী মেয়র বললেন, "পাঁচ বৎসর পূর্বে সাংহাইয়ের মুক্তি লাভের দিন থেকেই জনসাধারণ কঠোর শ্রম করছে। বিভিন্ন সমস্যা ও ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও শহরে আজ নতুন জীবন সঞ্চারিত হয়েছে।"

ভোজসভায় বক্তৃতা দেবার সময় শ্রীনেহরু বললেন—"এশিয়া ও সমগ্র বিশ্বের পথে নয়া চীনের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। চীনের সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে আমার আগ্রহ চিরদিনই খুব বেশী। আজ স্বচক্ষে দেখার পর নূতন চীন সম্পর্কে আমার আগ্রহ আরো বেড়ে গিয়েছে। কেননা, চীন যেভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে, তা এশিয়া তথা সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চীন ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। নয়া চীনের কিছুটা আভাস আমি পেয়েছি। যেখানেই গিয়েছি সেখানেই দেশকে গড়ে তুলবার জন্যে বিপুল কর্মপ্রেরণা, উৎসাহ ও কঠোর শ্রমের আগ্রহ দেখতে পেয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই কর্মপ্রেরণা ও কঠোর শ্রম শীঘ্রই সার্থকতা লাভ করবে।"

মেয়রের ভোজসভার অনুষ্ঠানের পর প্রধান মন্ত্রী এখানকার এক রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শন করলেন। তিনি রঙ্গালয়ে প্রবেশ করলে দর্শকবৃন্দ দাঁড়িয়ে উঠে করতালি দিল ও প্রায় পনর মিনিটকাল হর্ষধ্বনি করল। চীনা রীতি অনুযায়ী শ্রীনেহরুও তাদের সঙ্গে করতালি দিলেন। আমরা সবাই অভিনয় উপভোগ করলাম। এইভাবে সাংহাইয়ে আমাদের প্রথম রাত্রি কেটে গেল।

২৮শে অক্টোবর।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী আজ নতুন চীনের জনক ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের পূর্বতন বাসগৃহ পরিদর্শন করলেন। ১৯২৩ সালে এই গৃহে বসেই ডাঃ সান্-ইয়াৎ-সেন সোভিয়েট দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী, কমিউনিষ্টদের সঙ্গে মৈত্রী এবং চাষী-মজতুর আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন—এই তিনটি নীতি স্বীকার করে নেন। শ্রীনেহরু গৃহে প্রবেশ করে সেখানে রক্ষিত ডাঃ সান্-ইয়াৎ-সেন এবং তাঁহার পত্নী মাদাম স্থং-চিং-লিনের ফটো সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন। মনে পড়ল এলাহাবাদে 'আনন্দ ভবনে' নেহরুর কক্ষে এই রকম একখানা ফটো আমি দেখেছি। তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনার এলাহাবাদের বাড়িতে এই ফটো দেখেছি বলে মনে হয়।'

"হ্যাঁ। পঁচিশ বছর আগে মাদাম স্থং-চিং-লিং এই ফটোগ্রাফেরই এক কপি আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তা আজো আমার কাছে আছে।" শ্রীনেহরু একটা শিশু-বিদ্যালয় ও শিশু-ভবনও পরিদর্শন করলেন। শিশু-বিদ্যালয়ে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তাঁর চারদিকে ঘুরে গান গাইল ও নাচল এবং তাঁর জামার আস্তিন ধরে টানল। শ্রীনেহরু তাদের জন্য ভারতবর্ষ থেকে আনা দুটো পুতুল উপহার দিলেন। শিশু-ভবনে প্রায় এক হাজার শিশু

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু নান্‌কিন শহরে সান-ইয়াত-সেনের প্রতিকৃতিতে মাল্য প্রদান করিতেছেন
গত বৎসরও শ্রীনেহেরু এই স্থানে এসেছিলেন

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু ও তাঁর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সাংহাইতে কিণ্ডারগার্ডেন ইনস্টিটিউটে একটি চীনা বালিকার সঙ্গে কথা বলছেন

শ্রীনেহরুকে ঘিরে নাচল, তালে তালে করতালি দিল এবং তাঁকে "কুন্ কুন্" (দাদামশাই) বলে সম্বোধন করলো। প্রত্যেকটি শিশুর গলায় লাল রঙের স্কার্ফ ছিল। একটি মেয়ে এগিয়ে এসে তারই একটা প্রধান মন্ত্রীর গলায় পরিয়ে দিলো।

বিকেলে আমরা প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাংহাইয়ের বিখ্যাত সরকারী বিপণি দেখতে গেলাম। চীনের মধ্যে এটি বৃহত্তম বিপণি। এখানে এক বিরাট জনতা শ্রীনেহরুকে এমন ভাবে ঘিরে রাখে যে, তিনি কিছুই কেনাকাটা করতে পারলেন না। দিল্লীর চাঁদনী চকও এর কাছে হার মেনে যায় এত প্রকাণ্ড এই বিপণি। এই বিপণিতে একসঙ্গে বিশ হাজার ক্রেতা কেনাকাটা করতে পারে। তৈরী পোষাক থেকে আরম্ভ করে স্কচ হুইস্কী পর্যন্ত অজস্র রকমের জিনিস-পত্র এখানে রয়েছে। শুনলাম এত বড় কেন্দ্রীয় বিপণি চীনে আর দ্বিতীয় নেই।

সরকারী বিপণিতে ঘন্টাখানেক কাটিয়ে শ্রীনেহরু সাংহাইয়ের বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা পরিদর্শন করলেন। কারখানাটি ১৯১৩ সালে তৈরী হয় এবং তখন এর মালিক ছিল ইংরেজ। কিছুদিন পরে এটা একটি মার্কিণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রী করা হয়। ১৯৫০ সালে কুওমিন্টাং বাহিনীর বোমাবর্ষণে কারখানাটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে আবার তাড়াতাড়ি মেরামত করা হয়। কাছাকাছি একটি আদর্শ পল্লী পরিদর্শন করে প্রধান মন্ত্রী মোটরে করে সারা শহরটি ঘুরে বেড়ালেন ছুটির মেজাজে।

আজ রাতেই শ্রীনেহরু হ্যাংচাও অভিমুখে যাত্রা করবেন। তাঁর চীন-ভ্রমণ সাংহাইতেই শেষ হলো। এইবার তাঁর বিমান চীনের আকাশে পাখা মেলবে ভারতের ভৌগলিক সীমা লক্ষ্য করে।

* * *

হ্যাচাও যাত্রার অবসরে ভাবছিলাম প্রধান মন্ত্রীর এই চীন-ভ্রমণের বিস্ময়কর কাহিনী। দেখলাম চীনা সরকার ও জনসাধারণের কাছ থেকে তিনি যে আদর আপ্যায়ন ও সশ্রদ্ধ অভিনন্দন লাভ করলেন, তা তাঁর সংবেদনশীল কবি-মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। পিকিংয়ে তাঁর বিদায় কালীন ভাষণে তারই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করেছে। আবার দেখেছি, বাঞ্ছিত ও বরেণ্য অতিথিকে বিদায় জানাতে গিয়ে চীনা সাধারণতন্ত্রের চেয়ারম্যান ও প্রধান মন্ত্রী প্রিয়জন বিচ্ছেদের ব্যথা অনুভব না করে পারেন নি।

সরকারী সম্বর্ধনার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যদি জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসের ওপর তা নিবদ্ধ করি, তা হলে এই কথা ভেবে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় যে, বাঁধভাঙা বন্যার মত যে ভাবাবেগ নগর ও গ্রাম সমূহের বুকে আজ উদ্দাম হয়ে উঠেছে তা এতদিন অবরুদ্ধ ছিল কোন্ পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে ? কোন্ গিরিগুহার অন্ধকারে তা এতদিন রুদ্ধ বেদনায় গুমরে মরছিল ? জানি, সাংবাদিকের জীবনে ভাবালুতার স্থান নেই, নেই উচ্ছ্বাসের অবকাশ ; তবু এই ঐতিহাসিক ভ্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করবার সুযোগ পেয়েছি বলেই, সংবাদের অন্তরালে ইতিহাসের বাস্তবতাকে যেন প্রত্যক্ষ করছি। তাই আশা ও আশঙ্কায় আন্দোলিত চিত্তে ভাব্‌ছি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগের এই পরিপূর্ণ প্লাবন কি আবার বিভেদ ও ব্যবধানের বালুকাতলে আত্মগোপন করবে ? অথবা, পারস্পরিক প্রীতির এই দুটো পৃথক ধারা একসঙ্গে মিলিত হয়ে প্রবাহিত হবে সমগ্র এশিয়ার বিস্তীর্ণ বুকের উপর দিয়ে ?

অতিথি এবং গৃহস্থ দুইজনেই শেষোক্ত আশাই প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে। পণ্ডিত নেহরু সে আশা ব্যক্ত করেছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় ও ভঙ্গীতে। প্রায় বিশ

বছর আগে চীনের গণবাহিনী মিঃ মাও-সে-তুং ও অন্যান্য চীনা নায়কদের নেতৃত্বাধীনে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যে দীর্ঘ অভিযান আরম্ভ করেছিল ভারতের প্রধান মন্ত্রী সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন, সে অভিযান তাঁর কাছে মুমুক্ষু একটা জাতির মুক্তি অভিযানের প্রতীকস্বরূপ হয়ে রয়েছে চীন সেদিন যে পথে যাত্রা শুরু করেছিল, ভারতও একদা হয়েছিল সেই একই স্বাধীনতা পথের যাত্রী ; দুই দেশই দুর্গম ও বিপৎসঙ্কুল সে পথ সার্থকতার সঙ্গে অতিক্রম করেছে। চীন ও ভারত তাই ভাই ভাই। অভিযানের এক অধ্যায়ে ভারত ও চীন ভিন্ন পথে যাত্রা করলেও তারা আজ এসে পৌঁছেছে—স্বাধীনতার স্বপ্নদৃষ্ট কাম্যভূমিতে। এখান থেকে যে পথ বের হয়ে গিয়েছে, ভারত ও চীনকে অধিকতর দুঃসাহসিকতাপূর্ণ অভিযানে একসঙ্গে যাত্রা করতে হবে সেই পথ অনুসরণ করে। তাদের সাম্‌নে লক্ষ্যরূপে জেগে থাকবে দুই দেশের কোটি কোটি নর-নারীর সুখ সমৃদ্ধির সংকল্প, বিশ্বশান্তি স্থাপনের দুশ্চর ব্রত। স্বাধীনতার সিংহদ্বারে উপনীত হবার জন্যে যারা একদা যাত্রা করেছিল, ভিন্ন পথে আজ তাদের হতে হবে এই দুরূহ ও দুর্গম পথের সহযাত্রী।

একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। চীনে এসে ভারতের প্রধান মন্ত্রী যত কথা বলেছেন, তার মধ্যে তিনি জোর দিয়েছেন বিশ্বশান্তি বিধানের ওপর। এমন কি ভোজসভাতেও তাঁর মুখে ছিল ঐ একই কথা—শান্তি। বিপ্লবী ও যোদ্ধা মাও-সে-তুংকে পর্যন্ত তিনি ভবিষ্যতে শান্তি সংস্থাপকরূপে দেখবার আশা করেছেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সমস্ত ভাবনা চিন্তা যেন আজ এই একটা মাত্র বিন্দুতে এসে সংহত হয়েছে। চীনের মন তিনি এই কারণেই স্পর্শ করতে পেরেছেন। মনে হলো দিগ্বিজয়ীর সাফল্যের চেয়েও এ বড়ো সাফল্য।

চীন এসে হাত মিলাল ভারতের সঙ্গে ; ভারত গিয়ে হাত মিলিয়ে এল চীনের সঙ্গে—এ তো শুধু নিছক সৌজন্য বা শিষ্টাচারের বিষয় নয়। দুই দেশের প্রধান মন্ত্রীর আসা-যাওয়ার ভেতর দিয়ে তাঁদের মধ্যে মৈত্রীর যে নতুন রাখী বিনিময় হয়ে গেল, তা শুধু রাজনীতির সাময়িক সূত্রে পরিণত না হয়ে স্থায়ী ও সত্যকার বন্ধুত্ব বন্ধনে পরিণত হবে এবং অদূর ভবিষ্যতে তা এশিয়ায় এক নতুন ইতিহাস রচনা করবে।

নয়

সাংহাই থেকে কাম্বোডিয়া

২৯শে অক্টোবর।

আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ ছিল বলে সকলে হ্যাংচাও পৌছতে এক ঘণ্টা দেরী হলো। সাংহাই থেকে একখানা স্পেশাল ট্রেনে করে প্রধান মন্ত্রী হ্যাংচাও অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন আগের দিন রাতে। ভোরবেলাতেই পৌঁছে যাবার কথা। কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড় থাকাতে গন্তব্যস্থলে পৌছতে ট্রেনের দেরী হয়। সাংহাই রেল ষ্টেশনে তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানাবার জন্যে হাজার হাজার লোক সমবেত হয়েছিল। মুহুর্মুহু "ভারত-চীন মৈত্রী চাই"—এই ধ্বনি ষ্টেশনের প্লাটফরমটি সচকিত করে তুলেছিল। রেলপথের দুই দিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তিন হাজার ছেলে পুষ্পস্তবক আন্দোলিত করে শ্রীনেহরুকে বিদায় সম্ভাষণ জানাল। কামরার জানলার কাছে দাঁড়িয়ে প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর কন্যা সহাস্য-বদনে তাদের অভিনন্দন গ্রহণ করেন।

হ্যাংচাওয়ের বিশালায়তন হ্রদটি সত্যই দেখবার জিনিস। প্রধান মন্ত্রী এখানে চার ঘণ্টাকাল ছিলেন। এই বিখ্যাত হ্রদে কিছুক্ষণের জন্যে তিনি নৌবিহার করলেন ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে সময় কাটালেন। শ্রীনেহরুর প্রকৃতিতে একটা পর্বত-প্রীতির ভাব আছে, পাহাড় দেখলে তাঁর মন খুব খুশি হয়। পশ্চিম হ্রদে নৌবিহার শেষ করে, তিনি একটি নির্জন পর্বতে আরোহণ করে প্রকৃতির সৌন্দর্য দুই চোখ ভরে পান করলেন। প্রকৃতির বিশাল নিঃসঙ্গ পটভূমিকায় অবস্থিত বলেই এই পর্বতটির নাম রাখা হয়েছে

'নির্জন পাহাড়'। পুরাকালে কেবলমাত্র চীনসম্রাটদেরই অধিকার ছিল এই পাহাড়ে উঠবার।

হ্যাংচাওতে আমরা আর একটি সুন্দর জিনিস দেখলাম। একটি রুক্ষ শিলাময় পাহাড়ের ওপর পঞ্চদশ শতাব্দীর একটি বৌদ্ধ মন্দির। মন্দিরটি যে সুপ্রাচীন তা সহজেই বোঝা যায়। বহু শতাব্দীর পাদবিক্ষেপের চিহ্ন মন্দিরের ভিতরে ও বাইরে বেশ পরিস্ফুট। তবে পরিবেশ যেমন রমণীয় তেমনি ভাবগম্ভীর। স্থানীয় অধিবাসীদের মুখে শুনলাম যে, এই মন্দিরের বুদ্ধমূর্তিটি ভারতবর্ষ থেকে আনা হয়েছে। মনের পটে মুহূর্তের জন্য অমনি ঝিলিক মেরে গেল ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা যার ওপর বুদ্ধ-আত্মার জ্যোতির্ময় অভ্যুদয় আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে রয়েছে। মহাকালের স্থূল হস্তাবলেপে তা কোনও দিনই ম্লান হবার নয়। করুণা-ঘন বুদ্ধ-মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে, লক্ষ্য করলাম, শ্রীনেহরুর প্রশান্ত মুখখানিতে কী এক অনির্বচনীয় ভাব। করুণা ও কোমলতায় মাখানো সেই মুখের চারদিকে যেন রচিত হয়েছে একটা জ্যোতির্ময় পরিমণ্ডল যার শীতল আভা এশিয়ার বুকে অমৃত সিঞ্চন করছে। শান্তির পূজারী নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন শান্তির মহিমান্বিত অবতারের সামনে। প্রধান মন্ত্রীর মহাচীন ভ্রমণের সঙ্গী হিসেবে আমার সাংবাদিক জীবনে এই এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। মন্দিরের পীতবসন পরিহিত এক লামা এসে প্রধান মন্ত্রীকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

সরল-প্রাণ লামা আমাদের বললেন—"শুধু এই বুদ্ধমূর্তি নয়, গোটা পাহাড়টাও এসেছিল আপনাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ থেকে।"

অমনি প্রধান মন্ত্রীর সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ভারতবর্ষ থেকে এতখানি পথ পাহাড়টা হেঁটে এল, এ আপনি বিশ্বাস করেন?"

"করি বৈ কি। আমার পূর্ববর্তী লামারাও তাই বিশ্বাস করতেন।" অপ্রতিভভাবেই উত্তর দিলেন মন্দিরের সৌম্যবদন পুরোহিতটি।

"কিন্তু পাহাড় যে সত্যি হাঁটে না, তা তো বুঝতে পারেন। তবে এই অন্ধ-বিশ্বাস কেন ?"

"বিশ্বাস বিশ্বাস। আজ হাঁটে না, একদিন নিশ্চয়ই হাঁটতো।"

* * *

হ্যাংচাও-এ প্রধান মন্ত্রী দুটি প্রচীন বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করলেন। তার মধ্যে একটি বিহার শুনলাম, প্রায় এক হাজার বছরেরও বেশী প্রাচীন। এখানে নিরেট পাথরের ও ব্রোঞ্জের তৈরী বুদ্ধমূর্তি ও তাঁর শিষ্যবর্গের মূর্তি ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন হিসেবে আমাদের বিমুগ্ধ দৃষ্টিপথে যেন অতীত ইতিহাসের সকল সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য নিয়ে আবির্ভূত হলো। পীতবাস পরিহিত ভিক্ষুগণ শ্রীনেহরুকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিহারের ভিতর ও বাহির সব দেখালেন এবং তিনিও খুব আগ্রহের সঙ্গে এবং অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি নিয়ে দেখতে লাগলেন। বিহারটির এখন সংস্কার কার্য চলছে। প্রধান মন্ত্রী পরম কৌতূহল-ভাবে চীনা শ্রমিকদের মাচানের ওপর দাঁড়িয়ে রং লাগাতে দেখলেন। একজন ভিক্ষুকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনাদের দেশে এইসব পুরাকীর্তির সংস্কারের জন্য খরচ দেয় কে ?"

ভিক্ষু উত্তরে বললেন—"সরকার অনেক টাকা খরচ করে প্রতি বছর প্রচীন কীর্তি ও মন্দিরসমূহের সংস্কার করিয়ে থাকেন।".

কমিউনিষ্ট চীনের আরেক পরিচয় পেলাম ভিক্ষুর এই উত্তরটির মধ্যে।

* * *

হ্যাংচাওয়ে কয়েক ঘণ্টা অবকাশ যাপন করার পর শ্রীনেহরু আজ বিকেলে ক্যাণ্টনে এলেন। ক্যাণ্টনের বিমানঘাঁটিতে তাঁর প্লেন যখন নামল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। দেখলাম বিমানঘাঁটিতে ক্যাণ্টন প্রাদেশিক কমিটির চেয়ারম্যান ও অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ শ্রীনেহরুকে অভ্যর্থনা করলেন। হ্যাংচাও থেকে ক্যাণ্টন পর্যন্ত আবহাওয়া ঝটিকা সংকুল ছিল বলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে আমাদের বেশী দেরী হলো।

রাত্রে স্থানীয় গভর্ণর এক ভোজসভায় প্রধান মন্ত্রীকে আপ্যায়িত করলেন। চীন-ভ্রমণে এই শেষ ভোজসভা এবং এই নৈশভোজে যোগদান করবার সময় মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। যাক, বাঁচা গেল। পাকস্থলীর ওপর এই দশ বার দিন চর্বচোষ্য-লেহ্যপেয়ের যে দৌরাত্ম্য চলেছে, তা কল্পনা করাও কঠিন। রসনাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ক্রমাগত সুখাদ্য খেয়ে। ভোজসভায় প্রধান মন্ত্রী স্বপ্নাতুর কণ্ঠে বললেন—"আমার চীনে অবস্থানকালে আমি খুব মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আগের চেয়ে আমার এই বিশ্বাস এখন দৃঢ়তর হয়েছে যে, ভারত ও চীনের মঙ্গল, তথা বিশ্বশান্তির খাতিরে এশিয়ার এই দুটি দেশের মধ্যে নিবিড় সহযোগিতার প্রয়োজন খুব বেশী।"

* * *

৩০শে অক্টোবর।

বার দিনের চীন-ভ্রমণের আজ পরিসমাপ্তি।

আজ সকালে ক্যাণ্টন থেকে যাত্রা করবার সময় ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে ভালোবাসাপূর্ণ বিদায় অভিনন্দন জানালো চীন। মোটর-যোগে বিমানঘাঁটিতে যাওয়ার সময় ক্যাণ্টনের জনসাধারণ শৃঙ্খলার সঙ্গে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে নীরবে তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন

করলো। স্নেহ ও প্রীতির এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিতে প্রধান মন্ত্রী অভিভূত না হয়ে পারলেন না। এতখানি অভিভূত হতে তাঁকে খুব কমই দেখেছি। বিশ হাজারের বেশী লোক ক্যান্টন বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত ছিল। অন্তরের গভীর ভাবাবেগ যেন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে মূর্তিধারণ করলে বিমানঘাঁটির সেই উন্মুক্ত আকাশের তলায়। চীনের প্রভাত-সূর্যের আলোয় বায়ু হিল্লোলে আন্দোলিত চীন ও ভারতের জাতীয় পতাকার সমাবেশের মধ্যে বিদায়ের সেই দৃশ্য এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি হিসাবে মনের পটে চিরদিনের মতো আঁকা রইল।

ক্যান্টন বিমানঘাঁটিতে কোয়াং তুং প্রাদেশিক কমিটির চেয়ারম্যান, ক্যান্টনের মেয়র, ভারতস্থিত চীনা রাষ্ট্রদূত, পিকিংয়ের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও চীনা পররাষ্ট্র দপ্তরের পদস্থ কর্মচারীবৃন্দ শ্রীনেহরুকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। সমবেত জনতার উদ্দেশে বিদায়-বাণীতে ভাববিহ্বল স্বরে প্রধান মন্ত্রী বললেন: "এই প্রাচীন দেশের অনেক কিছুকে আমি নতুন রূপে দেখতে পেলাম। কিন্তু চীনের তরুণদের মুখাকৃতি দীর্ঘকাল আমার স্মরণে থাকবে। তাদের মুখগুলি সতেজ, কর্মচঞ্চল ও আনন্দোচ্ছাসিত। চীনে এই দশ দিন অবস্থান করে আমি প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। ভারত ও চীন উভয়েই কঠিন দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কর্তব্য হচ্ছে সুদৃঢ় ভিত্তিতে বিশ্ব-শান্তি স্থাপন এবং এই কর্তব্যসাধনে ভারত ও চীন পরস্পরের সহযোগিতা করবে। চীন গভর্ণমেন্ট ও চীনের জনসাধারণকে তাঁদের বন্ধুত্ব ও আতিথেয়তার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি চীনের স্মৃতি। এই স্মৃতিই আমাকে উৎসাহ ও শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত করবে। জয় হিন্দ্।"

বিমানঘাঁটিতে আসবার আগে শ্রীনেহরু মিঃ মাও-সে-তুং ও মিঃ চৌ-এন-লাইয়ের কাছে দুটি ব্যক্তিগত বার্তা পাঠিয়ে বিদায় গ্রহণ করতে ভোলেন নি। ঐ বার্তায় তিনি তাঁদের আন্তরিক আতিথ্য ও সপ্রীতি অনুরাগের কথাও উল্লেখ করেন। এ রকম শিষ্টাচারে আমাদের প্রধান মন্ত্রী চিরদিনই প্রসিদ্ধ।

এইবার শ্রীনেহরু প্লেন ছাড়বে। সঙ্গীতের ঐক্যতানের মতো সমবেত সেই জনতার হাতে সহস্র পতাকা শেষবারের মতো দুলে উঠলো। সকন্যা প্রধান মন্ত্রী হাসিমুখে দাঁড়ালেন এবং ঘন ঘন হাত দোলাতে লাগালেন। এ দৃশ্য বহুকাল মনে রাখার মতো। আমাদের বিমান এবার উড়ল সায়গনের দিকে।

* * *

সায়গন আসবার পথে শ্রীনেহরু ভিয়েৎমিন রাজধানী হ্যানয়ে এক ঘণ্টার জন্য থামলেন। ভিয়েৎমিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ফামভানডং ও ভিয়েৎনামের আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধায়ক কমিশনের ভারতীয় প্রতিনিধি মেজর জেনারেল থরগলকর তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। প্রধান মন্ত্রী মোটরযোগে পাঁচ মাইল গিয়ে সম্রাট বাওদাইয়ের পূর্বতন প্রাসাদের মধ্যে একটি শিবিরে অবস্থিত ভারতীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

বিকেলে আমরা সায়গনে পৌঁছলাম।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মৃতিপূত এই সায়গন।

"কম্যুনিজমের সঙ্গে আপোষ চলবে না"—এই ধ্বনি করে দক্ষিণ ভিয়েৎনামীরা প্রধান মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানালো।

সায়গন বিমানঘাঁটিতে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও ভারতীয় পতাকা উড়তে দেখলাম। সুসজ্জিত সেই বিমানঘাঁটিতে দক্ষিণ ভিয়েৎ-

নামের প্রধান মন্ত্রী ন্‌গম দিন দিয়েম্‌, ভিয়েৎনাম জাতীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নগ্‌য়েনে ভান্‌ হিন, আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধায়ক কমিশনের সভাপতি শ্রী এম. জে. দেশাই, কূটনৈতিক প্রতিনিধিবর্গ ও সায়গনের ভারতীয়গণ শ্রীনেহরুকে অভ্যর্থনা জানালেন।

বিমানঘাঁটিতে একটা ছোট অপ্রীতিকর ঘটনা ঘট্‌লো। যে দু'হাজার ভারতীয় প্রধান মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলেন, তাঁরা প্রধান মন্ত্রী বিমান থেকে নামা মাত্র এমন বিশৃঙ্খলভাবে গিয়ে তাঁকে ঘিরে ধরেন যে তিনি তাতে রীতিমত বিরক্তি প্রকাশ করলেন। একটু ধমক দিয়ে তাদের হিন্দীতে বললেন—"উৎসাহ ভাল, কিন্তু শৃঙ্খলাহীন উৎসাহ ভাল নয়। আপনারা শৃঙ্খলা শিখুন, শৃঙ্খলাপ্রিয়তা অভ্যাস করুন।" অমনি চারদিক নিস্তব্ধ হলো। জনতার সেই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সংযত হলো।

সায়গন বিমানঘাঁটি থেকে প্রধান মন্ত্রী চললেন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রধান মন্ত্রীর আবাসে। বিমানঘাঁটি থেকে মিঃ ন্‌গো দিন দিয়েমের ভবন পর্যন্ত যাবার পথে যেসব তোরণ ছিল, তাতে শ্রীনেহরুর পররাষ্ট্র নীতির নিন্দাসূচক বাক্য লেখা ছিল। প্রধান মন্ত্রীর ভবনের সামনে একটি তোরণে লেখা ছিল, "স্বাগত ভারতের প্রধান মন্ত্রী—সহ-অবস্থান নীতি নিপাত হোক্‌।"

বিমানঘাঁটিতে শ্রীনেহরুর সামনে কতকগুলি পুস্তিকা প্রচার করা হয়। একটা পুস্তিকা আমার হাতে এল। তাতে লেখা রয়েছে —"ব্যক্তি হিসেবে ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা হিসেবে শ্রীনেহরুর প্রতি ভিয়েৎনামীদের অগাধ শ্রদ্ধা আছে। আমরা ভারতের বন্ধুত্ব কামনা করি।" পুস্তিকার অন্যত্র আবার লেখা আছে, "কমিউনিষ্ট একনায়কত্বের অধীনে ভিয়েৎনামীদের ওপর যে নির্যাতন হয়েছে, তাতেই কম্যুনিজমের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা কম্যুনিজমের সঙ্গে যে কোন আপোষের বিরোধী।" দেখলাম এই পুস্তিকায় ভিয়েৎনাম জাতীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল হিন এবং কাওদাই, হোয়াহাও ও বিন জুয়েনপন্থী দলের বাহিনীর অধ্যক্ষগণ স্বাক্ষর করেছেন।

সায়গনে আসার ছ'ঘন্টার মধ্যেই মিঃ নগো দিন দিয়েমের সঙ্গে শ্রীনেহরু প্রায় ৯০ মিনিট কাল আলাপ করেন। শুনলাম এ আলাপ আলোচনা বেশ খোলাখুলি ভাবেই হয়েছিল। আলোচনার পর প্রধান মন্ত্রী আমাদের জানালেন :

"আমাদের মধ্যে অনেক বিষয়েরই আলোচনা হয়েছে। অবশ্য তার মধ্যে ভিয়েৎনামের প্রসঙ্গ বাদ যায় নি। আলোচনার ভেতর দিয়ে এই জিনিসটা স্পষ্ট হলো যে ভিয়েৎনামের সামনে আজ যে সমস্যা রয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে তার একটা মীমাংসা হওয়া দরকার।"

মিঃ দিয়েম আমাদের জানালেন যে, ভারতের প্রধান মন্ত্রী তাঁকে তাঁর চীন-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথাও বলেছেন এবং সেই সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বর্তমান সমস্যার সম্পর্কে তাঁর মতামতও জানিয়েছেন। "আপনাদের প্রধান মন্ত্রীকে যদি আমরা এশিয়ার নায়কের পদে বসাতে পারি, তাহলে এশিয়ার খণ্ডবিচ্ছিন্ন জাতিগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হতে পারে।" আমাদের মধ্যে একজন মিঃ দিয়েমকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন আপনাদের নেতা মিঃ হো-চি-মিনকে এই সম্মানের পদে বসাতে চান না ?"

"না—এশিয়ার নেতৃত্ব করতে পারেন একটি লোকই ; তিনি আপনাদের প্রধান মন্ত্রী।"

সায়গনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী বললেন : "কম্যুনিজমের সঙ্গে সহ-অস্তিত্ব শুধু সম্ভব নয়, বর্তমানে এই পন্থা অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।"

"আপনি কি ভারতের রাজনীতি থেকে অবসর নেবেন ?"

"কখনই না। সমস্যাকে এড়িয়ে চলা আমার প্রবৃত্তি নয়।"

* * *

৩১শে অক্টোবর।

আজ সকালে আমরা নোম্ পেন্হের রাজধানী কাম্বোডিয়ায় এসে পৌঁছলাম। এবার আমরা ঘরমুখো। বিমানঘাঁটিতে কাম্বোডিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ পেন নাউথ ও তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যগণ কাম্বোডিয়ার আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধায়ক কমিশনের চেয়ারম্যান মিঃ জি. পার্থসারথি এবং কমিশনের পোল্যাণ্ড ও কানাডার সদস্যবৃন্দ, কূটনৈতিক কর্মচারীবৃন্দ ও স্থানীয় ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ শ্রীনেহরুকে অভ্যর্থনা জানালেন।

সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করার পর প্রধান মন্ত্রী ভারতীয়দের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁরা মুহুর্মুহু "নেহরু কী জয়" ধ্বনি তুললেন। মৃদু হেসে তিনি তাদের অভিবাদন গ্রহণ করলেন, কিন্তু লাইনের বাইরে যেই দু'জন ভারতীয় এসে পড়ল, অমনি শ্রীনেহরু তাদের কাছে এসে পিঠ চাপড়িয়ে ঠিকভাবে দাঁড়াতে বললেন। একজন ভারতীয় ব্যবসায়ীর তিন বছরের মেয়েটি এসে যখন তাঁকে ফুলের মালা দিল, শ্রীনেহরু অমনি নীচু হয়ে গলাটা বাড়িয়ে দিলেন। মালা দেওয়া হলে পরে তিনি মেয়েটিকে আদর করে একটা চুমু খেলেন এবং তার হাতের সেলুলয়েডের পুতুলটার পিঠ চাপড়াতেও ভুললেন না। ভয়ে মেয়েটি হাত সরিয়ে নেয়, পাছে প্রধান মন্ত্রী তার পুতুলটা কেড়ে নেন।

বিমানঘাঁটিতেই কয়েকজন রিপোর্টার তাঁকে প্রশ্ন করে বসলো। "চীন ঘুরে এলেন, কি রকম বুঝ্লেন ?"

"ভালই।"

"ওরা যুদ্ধ চায় না শান্তি চায় ?"

"শান্তির জন্যেই চীনের বেশী আগ্রহ দেখলাম। যুদ্ধ ওরা এড়িয়ে চলতে চায়।

"আর কি দেখলেন ?"

"দেখলাম চীনা জনসাধারণ ও চীনা সরকারের মনে এখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই। এই রকম তিন চারটে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর পর আসবে। অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কাজে চীন এখন সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছে। এই মহৎ কাজে কোন বিঘ্ন যাতে না আসে তাই তারা চায়। যুদ্ধের চেয়ে বড় বিঘ্ন আর কি আছে এসব ব্যাপারে—কাজেই তারা যুদ্ধ চায় না।

"শান্তিপূর্ণ সহ-অস্তিত্বের বদলে আর কি সম্ভব ?"

"সংঘাত ও সংঘর্ষ অর্থাৎ রক্তপাত ও যুদ্ধ। অন্য জাতির আদর্শ বা গভর্ণমেন্টকে যদি শ্রদ্ধা না করতে পারি, সহ্য করতে না শিখি, তাহলে ত যুদ্ধ ছাড়া পথ নেই।"

"ভারত ও চীনের মধ্যে কোন সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে ?"

"নিশ্চয়ই না। এ ধরণের কোন চুক্তির প্রস্তাবই তারা করে নি, কারণ ভারতের পররাষ্ট্রনীতির কথা চীনের বিলক্ষণ জানা আছে। চীনের নেতারা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোনেশিয়াতে তাঁরা কম্যুনিজম বিস্তারের বিরোধী। তবে ভবিষ্যতের কথা কেউই সঠিক বলতে পারে না।"

"ইন্দোচীন সম্বন্ধে চীনের কি মত ?"

"চীনের নেতারা সবাই বিশ্বাস করেন যে ইন্দোচীনের যুদ্ধবিরতির জন্য জেনেভা-চুক্তি পৃথিবীর পরিস্থিতি একটু সহজ করে দিয়েছে।

সমস্যা এখনও অবশ্য আছে, তবে পরিস্থিতি যে আগের চেয়ে অনেক আশাপ্রদ সে বিষয়ে চীনের নেতাদের মনে কোনও সংশয় দেখলাম না।"

"ইন্দোচীনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার নিজের কি ধারণা?"

"ইন্দোচীনের বিভিন্ন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ পরস্পরের ওপর নির্ভর করছে এবং অন্য দেশের দ্বারা তা বিঘ্নিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ভিয়েৎমিন নেতা ডাঃ হো-চি-মিনের সঙ্গে আমার হ্যানয়ে দেখা হয়েছে আর ভিয়েৎনামের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে এবার দেখা হলো— এঁরা দুজনেই পরিপূর্ণ ভদ্রলোক। কাজেই সমস্যা সমাধানের পক্ষে অসুবিধের কিছু নেই। ইন্দেচীনের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে সোজাসুজি সম্পর্ক থাকাই ভাল; কোন রকম মধ্যস্থতার ভেতর দিয়ে আপোষ-আলোচনায় কোন স্থায়ী ফল হয় না। ডাঃ হো-চি-মিনের সঙ্গে আমার যতটুকু আলাপ হয়েছে তাতে করে এই ধারণাই আমার বদ্ধমূল হয়েছে যে তিনিও একজন শান্তিকামী এবং তিনি জেনেভা-চুক্তিকে সম্মান করবার প্রতিশ্রুতিও আমাকে দিয়েছেন।"

"ইন্দোচীনের সমস্যা সমাধানে ভারতের নৈতিক দায়িত্ব আছে কি না?"

"আছে বৈ কি, বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধায়ক কমিশনে থাকতে আমরা যখন সম্মতি হয়েছি তখন এ বিষয়ে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন। আমি আশা করি কমিশন সুষ্ঠুভাবেই তার কাজ সম্পন্ন করতে পারবে।"

* * *

কাল রাতে সায়গনে নৈশভোজের কথা বলতে ভুলে গেছি। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রধান মন্ত্রী মিঃ দিয়েম শ্রীনেহরুকে কাম্বোডিয়ার

রাজার আলোকোজ্জল নোরোদম প্রাসাদের উন্মুক্ত লনে এক নৈশ-ভোজসভায় আপ্যায়িত করলেন। ফরাসী হাই কমিশনার জেনারেল এলি, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ ; কাওদাই ও হোয়াহাও সৈন্যদলের অধিনায়কবৃন্দ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন। ভোজসভাটিও বেশ উপভোগ্য হয়েছিল।

* * *

১লা নভেম্বর।

আজ সকালে প্রধানমন্ত্রী কাম্বোডিয়ার বিখ্যাত আঙ্কোর ভাট মন্দির ও অন্যান্য দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখলেন। প্রাচীন দিনের সভ্যতার নিদর্শন দেখে তিনি খুব খুশি হলেন। এই সভ্যতার ওপর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব আজো বিদ্যমান। আজ মধ্যাহ্নে শ্রীনেহরু কাম্বোডিয়ার রাজা নোরোদম সিহানুকের সঙ্গে তাঁর প্রাসাদে ভোজন করলেন। গতকাল রাজার ৩৪তম জন্ম বার্ষিকী উৎসব গিয়েছে। স্থানীয় প্রথামত এই উৎসব চলবে চার দিন ধরে। প্রাসাদের পুরস্ত্রীরা,বিশেষ করে রাজমাতা, নেহরু-কন্যা শ্রীইন্দিরাকে কম খাতির করলেন না। কাম্বোডিয়ার এই তরুণ রাজাটিকে প্রধান মন্ত্রীর খুবই ভাল লাগল। সদালাপী ও মিষ্টভাষী লোক। রাজ-অন্তঃপুরের মহিলারাও বেশ শিষ্টাচার সম্পন্ন।

বিকেলে তত্বাবধায়ক কমিশনের সদস্যগণের সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী চায়ের টেবিলে মিলিত হলেন এবং সন্ধ্যায় কমিশনের চেয়ারম্যান মিঃ পার্থসারথির এক অভ্যর্থনা সভায় যোগ দিলেন।

তাঁর ঐতিহাসিক চীন-ভ্রমণের পরিসমাপ্তি এইখানেই।

আগামীকাল প্রত্যুষে রেঙ্গুন হয়ে প্রধান মন্ত্রী কলকাতায় ফিরবেন।

দশ

চীনে কি দেখলাম ?

চীনে কি দেখলাম ?

প্রাচীন সম্রাটের অট্টালিকা, একাধিক পুরাকীর্তি, প্রাসাদ, উদ্যান, মন্দির বাজার এই সব, না আরো কিছু ? এ সবই দেখেছিলাম এবং প্রত্যেকটি দেখবার ও বলবার মত—কিন্তু সকলের চেয়ে যা আশ্চর্য দেখলাম সে হলো জাতিগঠনের ঐন্দ্রজালিক দৃশ্য। চীনের জনসাধারণের এই অদ্ভুত রূপান্তর কি মন্ত্রবলে হয়েছে তারই পরিচয় এবার প্রত্যক্ষ করে এলাম ভারতের প্রধান মন্ত্রীর চীন ভ্রমণের সঙ্গী হয়ে। অন্য দেশের জাগরণ সম্পর্কে চিন্তাশীল দর্শকের কথা শুনেছি, লেখাও পড়েছি। এবার চীনে স্বচক্ষে ও স্বকর্ণে জাতিগঠনের পন্থার বিষয় দেখা ও শোনা গেল। কালের প্রগতি অতি প্রচণ্ড শক্তি। তার প্রতিকূলে দাঁড়াবার শক্তি কারো নেই। তাই অহিফেন-অভিশপ্ত সেই চীনের চিহ্ন পর্যন্ত আজকের নয়া চীনে দেখা গেল না। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন থেকে একালে মাও-সে-তুং পর্যন্ত নব্য চীনের যেসব নায়কবৃন্দ এই নতুন চীনগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের স্বপ্ন ও সাধনা যে ব্যর্থ হয়নি তা এবার চীনে গিয়ে প্রত্যক্ষ করলাম। এই নতুন প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কাজে চীনের জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্যমের আজো শেষ নেই।

চীনে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর বিরাট সম্বর্ধনা ও সম্মানের কারণ কি ? অভ্যর্থনার এত বড় ধুমধাম এর আগে শুনলাম আর কোন

বিদেশী রাজনীতিক বা রাষ্ট্রনায়কের ভাগ্যে ঘটেনি। স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী হিসেবে শ্রীনেহরু আজ জগদ্বিখ্যাত। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভা দেশে-বিদেশে আজ বিশেষভাবে সমাদৃত; পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও তাঁর কম নয়। গান্ধীযুগে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের তিনি যেমন এক সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন, স্বাধীনতা লাভের পর নূতন ভারত গঠনের কাজেও তাঁর দূরদর্শিতা ও প্রতিভা সমানভাবেই কার্যকরী হয়েছে। শুধু ভারত নয়, আজ সমগ্র এশিয়াই যেন তাঁর কণ্ঠ আশ্রয় করে কথা বলতে চায়। তাই নয়া চীনের রাষ্ট্রনায়কগণ, এবং জনসাধারণ অকুণ্ঠভাবেই তাঁকে অভ্যর্থনা না করে পারেন নি।

* * *

চীনে গিয়ে দেখে এলাম কলকারখানা, ক্ষেত-খামারে, স্কুল-কলেজে সর্বত্র গঠনের এক প্রবল বন্যা। অন্যের দেশ আক্রমণ না করে, অন্যের সম্পত্তি লুণ্ঠন না করে নিজের সামর্থ্য ও সঙ্গতিতে সমগ্র দেশ যেন এগিয়ে চলেছে শান্তিপূর্ণ উদ্যম নিয়ে। মাদাম সুন চিং লিং-কে যখন জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার মহান দেশের নবজাগরণ প্রত্যক্ষ করে গেলাম। জিজ্ঞাসা করি, এত প্রাণশক্তি আপনারা পেলেন কোথায়?"

উত্তরে বিপ্লবী-নায়িকা বললেন—"আমাদের জাতি স্বাধীনতা লাভ করেছে, আর সেই সঙ্গে লাভ করেছে ঐক্য ও শক্তি। এই অসীম উদ্যমকে কাজে লাগিয়ে তারা কৃষিপ্রধান চীনের পরিবর্তে এক শিল্পপ্রধান দেশ গড়ে তোলার কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের অগ্রগতির সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অগ্রগতি নির্ভর করছে।"

ঠিক এমনি প্রত্যয়ের কথা পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের মুখেও শুনেছিলাম। ঘরে-বাইরে নয়া চীনের শত্রুর অভাব নেই; নিন্দুকের রসনা কত মিথ্যাই না রটনা করে পৃথিবীর লোককে বিভ্রান্ত করে তুলছে আজকের চীন সম্পর্কে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক আমাকে বললেন—"জানবেন, আমাদের একটিমাত্র মন্ত্র আছে—'Peace among the people—' আর এই মন্ত্রকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে যা কিছু চেষ্টা চলছে। চীন যে আজ সত্যিই ব্যাপক উন্নতির পথে, এক অন্ধ ছাড়া আর কেউ সে কথা অস্বীকার করবে না। আমরা চীনারা আমাদের যুগ-যুগান্তের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছি। পররাজ্য গ্রাসের ইচ্ছা আমাদের নেই। সকলের সঙ্গেই আমরা মহান সম্পর্ক বজায় রাখতে চাই। আবার আত্ম-রক্ষাতেও উদাসীন নই।"

*　　*　　*

নয়া চীনের শিল্পায়ন দেখে সত্যি বিস্মিত হতে হয়। শিল্পে অনগ্রসর জাতি কখনও সমৃদ্ধিশালী হতে পারে না, তাই মাও-সে-তুংয়ের চীন আজ উৎসাহের সঙ্গে বিশ্বকর্মার বিপুল উদ্যম নিয়ে নানাবিধ শিল্পসৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। আমরা বিশেষভাবে যেসব শিল্প-প্রচেষ্টা দেখে এসেছি তাই এখানে উল্লেখ করছি।

আনসানের ইস্পাতের কারখানার কথা আগে বলেছি। আনসান আয়রন এ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী ১৯৫২ সালে হেভি রোলিং মিলের কাজে হাত দেয় এবং ১৯৫৩ সালের শেষভাগ থেকে এই মিল থেকে ইস্পাত উৎপন্ন হতে থাকে। স্টীল কোম্পানীর বহুবিধ পরিকল্পনার মধ্যে এই একটি।

সিম্‌লেস টিউবিং মিল। এটিও ঐ আনসান ইস্পাত কারখানার একটি বিভাগ। সমগ্র চীনে যত লোহার পাইপের দরকার হয়, তার সবই এইখানে উৎপন্ন হয়। ১৯৫১ সালে মিলটি সর্বপ্রথম তৈরী হয়।

আনসান ইস্পাত কারখানার ৭নং অটোমেটিক ব্লাস্ট ফার্নেসে উৎপাদন কাজ শুরু হয়েছে ১৯৫৩ সালের শেষভাগে।

ঘরবাড়ি তৈরীর কাজে যত ইস্পাত দরকার হয় তার অধিকাংশই আজ আনসানের কারখানায় উৎপন্ন হয়।

উত্তর পূর্ব চীনের নবনির্মিত ২২০ কিলোওয়াট শক্তি সমন্বিত হাই-টেনসন ট্রানসমিসন লাইন; দৈর্ঘ্যে ৩৬০ কিলোমিটারেরও বেশি।

লিয়াওসি প্রদেশে ফুসিন অটোমেটিক পাওয়ার প্ল্যাণ্ট-এর কুলিং টাওয়ার। এই সুবৃহৎ প্ল্যাণ্ট মাত্র ৪০ সপ্তাহে নির্মিত হয়েছিল।

ওপন্‌-ফেস্‌ ফুসিন কোলিয়ারী। এই কয়লার খনির কাজ এখন পুরোদমে চলছে।

আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত একটি বল-বিয়ারিং কারখানা। ১৯৪৯ সাল থেকে এর কাজ শুরু হয়।

হার্বিনের ফ্লাক্স মিল। সোভিয়েট ইউনিয়নে তৈরী অতি আধুনিক যন্ত্র সমন্বিত এই মিলটির নির্মাণ কাজ ১৯৫২ সালে সম্পূর্ণ হয়।

জাতি গঠনের প্রায় সব কাজেই চীনের মেয়েরা আজ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছে। সার্ভেয়ারের কাজে পর্যন্ত শিক্ষিতা চীনা মহিলারা সাগ্রহে যোগদান করেছেন দেখলাম।

চীনের রেলপথের বিস্তার সাধন খুব বেশী হয়নি। বর্তমানে তাই রেললাইন তৈরীর কাজ পূর্ণোদ্যমে চলছে। ১৯৫২ সালের ১লা

অক্টোবর উত্তর-পূর্ব চীনে তিয়েনস্থই-লানচাউ রেলপথটি তৈরী হয়। দৈর্ঘ্যে ১০৩ কিলোমিটার ল্যাংচাউ-সিনকিয়াং রেলপথটি ১৯৫৩ সালের ১লা অক্টোবর যাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত হয়। এখনো উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব চীনে বহু শত মাইল ব্যাপী রেলপথের নির্মাণ কার্য চলছে।

তিয়েনস্তিন ডাইং এ্যাণ্ড প্রিন্টিং কারখানার টেক্সটাইল ডিজাইনাররা চীনের নানাবিধ লোকশিল্প থেকে ডিজাইনের প্রেরণা লাভ করে থাকেন।

ক্যান্টনের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত পার্ল নদীর মোহনায় প্রসিদ্ধ হোয়াম্‌পোয়া বন্দর। দক্ষিণ চীনের এইটাই স্থবৃহৎ বন্দর।

পীতনদীর বন্যায় নদীর দুই তীরবর্তী অঞ্চলের বহু ক্ষতি হয়ে থাকে এবং জমির উর্বরা শক্তিও নষ্ট হয়ে যেত। আগেকার কোনো সরকারের আমলে এই সমস্যাটার সমাধান করা হয়নি। বর্তমানে কয়েকটি বাঁধ নির্মাণের ফলে বন্যার জল নিয়ন্ত্রিত করছে।

চীনে সাধারণতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯৫০ সালে মেকানাইজড্ ফার্ম-এর প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের অনুর্বর জমি উর্বর জমিতে পরিণত হয়।

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি ও যৌথ খামার প্রচেষ্টা। লাঙলের পরিবর্তে ট্রাক্টর ব্যবহার করে চীনের কৃষিকার্যের বর্তমানে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। কেং চ্যাং-সো এগ্রিকালচারাল প্রডিউসার্স কোঅপারেটিভ ১৯৪৩ সালে মাত্র ৪ জন সভ্য নিয়ে গঠিত হয় এবং চীনে সমবায় কৃষির প্রথম পথ প্রদর্শন করে এই প্রতিষ্ঠানটি।

আমাদের দেশে যেমন আখ থেকে চিনি হয়, চীনেও তেমনি স্থগার বীট থেকে চিনি উৎপন্ন হয়। হার্বিনের স্থগার রিফাইনারী একটি প্রসিদ্ধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান।

কৃষিকার্যের উন্নতির জন্যে কৃষি-রাসায়নিকেরা কৃষি-সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয়ে গবেষণা কাজে লিপ্ত আছেন। চাংচুং রিসার্চ ইনস্টিটিউট এই ধরণের একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান।

পিকিং-এ একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এখানে বহু ছাত্রী পশু-প্রজনন সম্বন্ধে পড়াশুনা করে এবং ইনার মঙ্গোলিয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গোচরণ ভূমিতে গিয়ে হাতে-কলমে কাজ শেখে।

পোর্ট আর্থার-দাইরেন অঞ্চলে অজস্র আপেল হয়। এই আপেলের চাষ ও ব্যবসাও সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়ে থাকে।

হোপাই প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে কৃত্রিম উপায়ে সূর্যমুখী ফুলের চাষ করা হয়ে থাকে।

আমাদের দেশের দামোদর নদী পরিকল্পনার মত চীনের হুয়াই নদী পরিকল্পনার কাজ চলেছে। এই পরিকল্পনার অন্তর্গত একটি বৃহত্তম প্রচেষ্ট হলো সান্‌হো বাঁধ। নদীর শেষ প্রান্তে হুংসি হ্রদের মুখে এই বাঁধটি নির্মিত হয়েছে।

সিয়াংকিং প্রদেশে চিংপু হ্রদে বরফের নীচে মাছ ধরবার কাজে নিযুক্ত আছে চিংপু আকোয়াটিক্ প্রোডাক্টাস্ কোম্পানী।

পূর্ব চীনের চিকিয়াং প্রদেশের হ্যাংচাউয়ে বাঁশের ঝুরি তৈরী একটি উল্লেখযোগ্য কুটীর শিল্প। এই শিল্পে বেশীর ভাগ কর্মী হলো মেয়ে।

খেলাধূলাতেও চীন অমনোযোগী নয় দেখলাম। পিকিংয়ে একটি বিরাট ক্রীড়াভূমি (স্টেডিয়াম) আছে। এই স্টেডিয়ামটি সরকারী ব্যয়ে তৈরী। চীনের ছেলেমেয়েদের খেলাধূলায় মজবুত করে তোলার জন্যে একটি কেন্দ্রীয় ক্রীড়া পরিষদ (সেন্ট্রাল এথলেটিক ইনস্টিটিউট) আছে। এই ইনস্টিটিউটে ছাত্ররা ব্যায়াম

সম্পর্কে নানা রকমের সুবিধা ও শিক্ষা পেয়ে থাকে। ইনস্টিটিউটে সকল রকম খেলার ব্যবস্থাই আছে।

পিকিংয়ের সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ন্যাসনালিটিজ আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সকল জাতির লোকদের স্বার্থ ও সুবিধা দেখাই হলো এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। চীনের যেসব অনুন্নত অঞ্চলে এখনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাস করে আদিম জীবনধারা নিয়ে, তাদের উন্নতির চেষ্টা করা, তাদের জন্য স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন করাও এই ইনস্টিটিউটের বহুবিধ কার্যাবলীর অন্তর্গত।

শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যনিবাস (স্যানাটোরিয়াম) নয়া চীনের বহুমুখী প্রচেষ্টার আর একটি নিদর্শন। শ্রমিকরা এই স্বাস্থ্যনিবাসে সরকারী ব্যয়ে হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সুযোগ পায়।

পিকিংয়ের গ্রীষ্মাবাসটি (সাম্মার প্যালেস) প্রধান মন্ত্রীর খুব ভাল লেগেছিল।

হ্যাংচাওয়ের চারাঘর (নার্সারী) একটি দেখবার মত প্রতিষ্ঠান। সুবিন্যস্ত পুষ্পোদ্যানের মধ্যে ফুলের চারাগাছের যত্ন নেওয়ার প্রণালী খুবই আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত।

কান্সু প্রদেশে মাইচি পর্বত গুহায় প্রাচীন প্রস্তর-মূর্তি ভাস্কর্যের ও শিল্প সুষমার অপূর্ব নিদর্শন। চীনে আর একটি উল্লেখ-যোগ্য জিনিস দেখেছি। কল কারখানা ও শিক্ষায়তনে—প্রায় সর্বত্রই মাও-সে-তুং ও স্তালিনের একত্র ছবি। প্রাইমারী স্কুলের ক্লাসরুমে পর্যন্ত এই ছবি প্রচলিত আছে। গান্ধী বা রবীন্দ্রনাথের ছবি প্রকাশ্যে খুব কমই দেখেছি।

এগারো

সব শেষের কথা

প্রধান মন্ত্রীর ভ্রমণ-পথ এতক্ষণ পরিক্রমা করেছি। এবার সব শেষের কথা। ভ্রাম্যমাণের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা, সাংবাদিকের সুখ-সুবিধের কথা একটু পাঠকদের শোনাব। এ রকম রোমাঞ্চকর ভ্রমণ সাংবাদিক জীবনে আর দ্বিতীয়বার আসবে কিনা সন্দেহ। তাই দিল্লী থেকে পিকিং এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার ছোটখাট কয়েকটি অভিজ্ঞতা ও ঘটনার উল্লেখ করে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব।

যখন খবর পেলাম যে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর চীন ভ্রমণের সংবাদ সংগ্রহের জন্যে ভারত থেকে কয়েকজন বাছাইকরা রিপোর্টার পাঠান হবে এবং তাদের মধ্যে এই কাহিনীর লেখক একজন, তখন আমি যে খুব উল্লসিত হয়ে উঠেছিলাম তা নয়। কেননা চীন সম্বন্ধে আমার আগ্রহ থাকলেও, একটা বিষয়ে আমার মনে বরাবরই সংশয় ছিল। সেটা হলো চীনের সত্যকার অবস্থা সম্পর্কে সত্যকার সংবাদ সংগ্রহ এবং পরিবেশন। আজ পাঁচ বছর হলো চীনে সাধারণতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু এই পাঁচ বছরের সংবাদপত্র মারফৎ আমরা চীনের ভিতরকার খুব কম সংবাদই জানতে পেরেছি। তাই এই ভ্রমণের গোড়াতেই আমার আশঙ্কা ছিল যে চীনে গিয়ে হয়ত যবনিকা ভেদ করে সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনে স্বাধীনতা পাব না। কিন্তু চীনে গিয়ে দেখলাম আমার এ আশঙ্কা অমূলক।

চীন কমিউনিষ্ট দেশ। কিন্তু সে কম্যুনিজম যে চীনের নিজস্ব সে বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। চীনা জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণ-চাঞ্চল্য দেখে দেশটা কমিউনিষ্ট কি কমিউনিষ্ট নয়, সে কথা আদৌ মনে আসে না। একটা জীবন্ত জাগ্রত দেশের সব লক্ষণই চীনের সব কাজে পরিস্ফুট। চীনের মত একটা বৃহৎ দেশে দু-সপ্তাহের জন্যে গিয়ে তার সবটাই যে দেখা হলো বা তার সব সমস্যা জানা গেলো—এমন কথা কোন বুদ্ধিমান সাংবাদিক কখনও বলবে না। তবে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর ভ্রমণের সঙ্গী হওয়ার এই একটা মস্ত সুবিধা ছিল যে অল্প সময়ের মধ্যে চীনের অনেকটাই দেখা ও জানা গেল। আর যেসব সুবিধা আমরা পেয়েছিলাম তা অবশ্য অন্য অবস্থায় সম্ভব হতো না। ক্ষিপ্র গতিতে দর্শন ও পর্যবেক্ষণের ফলে যতটুকু জানা গেল তার মূল্য নেহাৎ কম নয়।

আমার রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও ছিল এবং সেই অভিজ্ঞতার আলোকে চীন সম্বন্ধে আমার মনে প্রথম যে প্রশ্ন উঠেছিল সেটা হলো এই। একনায়কতন্ত্র-শাসিত অন্যান্য দেশে অত্যাচারের যে পরিবেশ আছে, জনসাধারণের মনে যে সংশয় ও উদ্বেগ থাকে, চীনে তার অস্তিত্ব আছে কিনা? দেখলাম বর্তমানে তা নেই। শহরে ও শহরতলীতে এমন কি পল্লী অঞ্চলে কোথাও বিধি-নিষেধের অত্যাধিক কাঠিন্য নেই যা সাধারণত কমিউনিজম অধ্যুষিত দেশে থাকে। দেখলাম চীনের জনসাধারণের কণ্ঠ শাসন-সংযত নয়, গতিবিধি স্বচ্ছন্দ, ব্যবসা-বাণিজ্য অবাধ এবং লোকের কথাবার্তা বা চিন্তায় কোথাও কুণ্ঠা বা ভয়ের লেশমাত্র নেই। কারখানা থেকে অফিস, অফিস থেকে ক্ষেতখামার সর্বত্র লোকে হাসে, আমোদ করে এবং গান গায় মনের আনন্দে; রাস্তা দিয়ে হাঁটে স্বচ্ছন্দে, পাদবিক্ষেপে জড়তা নেই এতটুকু। গুপ্তচরের সতর্ক দৃষ্টি কোথাও

তাদের অনুসরণ করে না। সত্যিকারের স্বাধীনতার উজ্জ্বল পরিবেশ দেখে এলাম চীনে।

শ্রীনেহরু অথবা তাঁর ভ্রমণের সরকারী সঙ্গীদের যে কেউ যখনই যেখানে গেছেন এবং অনেক জায়গাতেই তাঁরা গেছেন বিনা নোটিশেও, সেখানেই পথের দুই ধারে জনতা তাঁদের অভিনন্দিত করেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সাংহাইয়ের ঘটনাটা আমার বিশেষ করে মনে পড়ে। এখানকার কেন্দ্রীয় বিপণিতে কিছু কেনার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে দেখবার জন্যে সমাগত অগণিত জনতার ভীড় ঠেলে দোকানের ভেতর পৌঁছনই গেল না। সেখানে কোন পুলিশ ছিল না যে জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে কিংবা ভীড়ের মধ্যে আমাদের পথ করে দেয়।

চীন সম্বন্ধে আর একটা প্রশ্ন ছিল মনের মধ্যে। যুদ্ধ না শান্তি —কোন্‌টি তার অভিপ্রেত ? অভিজ্ঞতায় বুঝলাম চীনের মতিগতি আপাততঃ শান্তির দিকে। অবশ্য একথা ঠিক যে কোনও রাষ্ট্রেরই সমরসজ্জা সম্পর্কে সঠিক বিবরণ কোন দর্শকের পক্ষে জানা আদৌ সম্ভব নয়—বিশেষ করে সে দর্শক যদি 'নিউট্রাল' দেশের অধিবাসী হয়। কিন্তু মুখ দেখে যদি মানুষের মন বোঝা যায়, তাহলে বলব যে সরকারী ও বে-সরকারী যত লোকের সঙ্গে আমরা কথা বললাম, তাদের কারো মুখেই যুদ্ধের আভাষ পেলাম না। যুদ্ধের চিন্তা থেকে চীনের সমষ্টিগত মন একেবারেই মুক্ত। বরং জনসাধারণ ও নেতৃবৃন্দের কথাবার্তার ভেতর দিয়ে এই সত্যটাই ফুটে উঠেছে যে চীন এখন শান্তি প্রয়াসী এবং শান্তিপথের বলিষ্ঠ যাত্রী। তার চিন্তা এখন সংগঠন অভিমুখী, ধ্বংসপথের যাত্রী এখন সে নয়। তাই না হংকং সীমান্ত থেকে চীন পর্যন্ত যেতে যেতে মনে হবে যেন শান্তি, শৃঙ্খলা ও সখ্যের এক বিশাল ভূমি পার হয়ে চলেছি।

আমাদের প্রধান মন্ত্রীরও দৃষ্টিতে নয়া চীনের এই মানসিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এড়ায় নি।

এর আরো একটা প্রমাণ পেলাম। অন্য রাষ্ট্রের মত চীন তার সামরিক শক্তির বর্বর প্রকাশে আদৌ বিশ্বাসী নয়। 'মুক্তি দিবসের' বার্ষিক উৎসবের দিনটি ছাড়া, চীনের খুব কম লোকই পথে ঘাটে সামরিক কুচ্‌কাওয়াজ দেখতে পায়। চীনে এ জিনিস একেবারেই বিরল। আমাদের চোখেও একটিও চীনা সৈন্য পড়েনি। চীনের এই সংযম সত্যই প্রশংসনীয়। চীনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের ভোজসভায় মাও-সে-তুং যখন এলেন, তখন আমরা শুনেছিলাম সমগ্র হোটেলটা 'মাইন ডিটেকটর' দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে তাঁর নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু এই খবরটাও আমরা পরে জানতে পেরেছিলাম হোটেলের একজন অধিবাসীর কাছ থেকে।

চীনের বর্তমান দুশ্চিন্তা হলো ফরমোজা। বিদেশী পর্যটকদের সম্পর্কে এখন যেটুকু বিধিনিষেধ আছে তা এক ফরমোজার জন্যেই। ফরমোজার ব্যাপারে আমেরিকার সরকারী মনোভাব সম্পর্কে চীনের মনে একটা প্রবল সংশয় ও সন্দেহ রয়ে গেছে। কিন্তু আমেরিকার লোক সম্পর্কে চীনের মনোভাব সত্যি উদার। এ বিষয়ে চীনাদের শিষ্টাচার মার্কিন শিষ্টাচারকেও লজ্জা দেয়। এই শিষ্টাচারের একটি দৃষ্টান্ত আমার চিরদিন মনে থাকবে। আমাদের সঙ্গে যেসব দোভাষী ও গাইড দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন তরুণ ছাত্র। তাদের মধ্যে একটিকে বিদায় দেবার সময় আমি বললাম—"আপনাদের আমরা খুব জ্বালাতন করেছি, এর জন্যে শুধু ধন্যবাদ জ্ঞাপন যথেষ্ট নয়, ক্ষমাও চাই।"

"এ কী কথা বলছেন আপনি? আপনাদের পরিচর্যা করতে গিয়ে এই ক'দিন আমার ঘুম বা পড়াশুনা কিছু হয়নি সত্যি, কিন্তু এর জন্যে আমি এতটুকু ক্লান্ত বা অসুখী নই। ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের সেবা করেছি বলে নয়, আপনারা মিঃ নেহরুর প্রতিনিধি সেই মনে করেই আমরা আপনাদের পরিচর্যায় নিযুক্ত থেকে আনন্দ পেয়েছি। আপনাদের প্রধান মন্ত্রীকে আমরা পৃথিবীতে শান্তির মূর্ত প্রতীক বলেই মনে করি।"

বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না যে আমাকে এই কথা বলছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ ছাত্র। সবশুদ্ধ দশজন সংবাদদাতা আমরা গিয়েছিলাম এখান থেকে। এর মধ্যে সাতজন প্রধান মন্ত্রী এখান থেকে রওনা হবার তিন দিন আগে ক্যান্টনে পৌঁছে যান। ক্যান্টন থেকে পিকিং এই দীর্ঘপথ তাঁরা রেলে ভ্রমণ করেছিলেন। নিখিল-চীন সাংবাদিক সমিতির পক্ষ থেকে আমাদের এই আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। চীনে আমার প্রথম বিস্ময় একটি রেলওয়ে স্টেশন। হংকং থেকে ৩০ মাইল দূরে চীনের সীমান্তবর্তী সেম্ সেন্ স্টেশন। যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তেমনি পরিপাটি শৃঙ্খলা। নূতন চীনের অভিব্যক্তিই হলো শৃঙ্খলাপ্রিয়তার ভেতর দিয়ে; শহর, শহরতলী গ্রামাঞ্চল—সর্বত্র সুনিপুণ শৃঙ্খলার ছাপ। স্টেশন প্লাটফর্মে জনতার বিরাম নেই, যাত্রীদল অবিরাম যাওয়া আসা করছে কিন্তু হৈ হল্লা নেই এতটুকু। ট্রেনের কামরায় উঠবে তাও কেমন 'কিউ' দিয়ে, ঠেলাঠেলি করে নয়; কামরা থেকে নামবে তাও ঐভাবে। প্লাটফর্মের ওপর এতটুকু ময়লা কোথাও চোখে পড়ল না; রেলকর্মচারীদের মধ্যে বেশীর ভাগই মহিলা, সবাই নিঃশব্দে আপন আপন কাজ করে যাচ্ছে।

আদর আপ্যায়নের চূড়ান্ত উপভোগ করেছি আমরা। ট্রেনে

যখন ভ্রমণ করেছি তখন ট্রেনের কামরা পরিষ্কার করার বহর দেখে আমরা অবাক হয়ে গেছি। আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য সকলই যেন ত্রস্ত ও ব্যস্ত। চীনের সবুজ চা যেমন উপাদেয় তেমনি উপাদেয় লাগল আমাদের কাছে চীনের সিগারেট। এই সিগারেট এত ভালো যে প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং তাঁর প্রিয় ইংলিশ্‌ ব্র্যাণ্ড ছেড়ে চাইনীজ সিগারেট উপভোগ করতে লাগলেন।

আমাদের চীন-ভ্রমণের সময় খাদ্য-সংকটের একটা কৌতুকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করব। ঘটনাটা ঘটেছিল হ্যাংকাও-পিকিং রেলপথে। হঠাৎ আমাদের গাইড আবিষ্কার করলেন যে আমাদের মধ্যাহ্ন খাবারের তালিকায় এমন কোন নিরামিষ খাদ্য নেই যা মাংসবর্জিত। সাতজনের মধ্যে তিনজন ছিলেন নিরামিষ ভোজী। একজন মুরগীতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন না যদি অবশ্য তার স্বাদ রসনার পক্ষে গ্রহণীয় হয়, আর একজন ডিম খেতে আপত্তি করলেন না। কিন্তু মুস্কিল হলো তৃতীয়জনকে নিয়ে—কোন রকম আমিষ গ্রহণেই যে তাঁর ঘোরতর অনিচ্ছা তা নয়, এমন কি ব্যাঙের ছাতায় তৈরী খাদ্য পর্যন্ত তাঁর কাছে মাংসের সামিল বলে প্রতীয়মান হলো। বন্ধুটিকে বললাম—"হ্যাংকাওতে প্রাতরাশের টেবিলে আপনি যে ওটমিল খেলেন, তার ভেতরে যে চিকেনের টুকরো আছে তা কি জানেন না?"

পরে পিকিংয়ে প্রধান মন্ত্রীকে যখন এই ঘটনার উল্লেখ করলাম, তখন তিনি টোকিওতে ভারতীয় লোক সভার তিনজন মহিলা সদস্যের এক অভিজ্ঞতার উল্লেখ করলেন। তিনজনের মধ্যে একজন হিন্দু, তিনি গোমাংস খান না ; দ্বিতীয়জন মুসলিম, তিনি শূয়োর স্পর্শ করেন না ; তৃতীয়জন একজন গোঁড়া হিন্দু বিধবা তিনি মাছ-মাংস স্পর্শ করা দূরে থাক, নিজের হাতে রান্না ভিন্ন অন্য খাদ্য গ্রহণ করেন না। তাঁরা যে জাপানী গৃহস্থের অতিথি হয়েছিলেন সেই গৃহস্বামীর

স্ত্রী বললেন—"একজন বীফ্ খাননা, একজন পোর্ক খান না আর তৃতীয়জন একেবারে কিছুই খান না, এমন অবস্থায় আমরা কী করব?" বলা বাহুল্য, তিনজনেই নিজের নিজের আদর্শ বজায় রেখে ফিরে এসেছিলেন।

চীনে বারবনিতা নেই, ভিক্ষুক নেই। রূপোপজীবিনীদের জন্যে সরকার কতকগুলি "হোমের" ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেখানে তারা কাজকর্ম করে জীবিকা অর্জন করে। ভিক্ষুকদের জন্যও ঐরকম ব্যবস্থা। তবে একটা বিষয়ে চীনা সরকারের নিয়ম বড় কঠোর—কোনও রকমের দুর্নীতি অর্থাৎ "Corruption" বরদাস্ত করা হয় না। দরকার হলে কঠোর শাস্তির দ্বারা তার প্রতিবিধান করা হয়ে থাকে। চণ্ডুর আড্ডার কোন অস্তিত্বই আজকের নতুন চীনে খুঁজে পাওয়া যায়না। চোর বা চৌর্য বৃত্তি নেই বল্লেই হয়।

মদ এখানে নিষিদ্ধ নয়, তবে দেখলাম মাত্লামীটা খুবই নিন্দনীয়। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় মদ্যপানে কোন বাধা নেই, কিন্তু মদ্যপায়ীর এতটুকু মত্ততা বা প্রকাশ্যে কিছুমাত্র অশোভন ব্যবহারকে এখানে সামাজিক অন্যায় কাজের মধ্যে গণ্য করা হয়ে থাকে। ফলে, চীনের রাস্তাঘাট, বারে বা রেস্তোরাঁয় মাতাল এক রকম দুর্লভ বললেই হয়। এ নৈতিক উন্নতিও কম প্রশংসার বিষয় নয়। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। সমগ্র জাতিকে কর্মঠ করে তোলার জন্যে শরীর চর্চায় প্রত্যেক চীনার অপরিসীম আগ্রহ দেখলাম। খেলাধূলার মধ্যে বাস্কেট বল খেলাটি খুবই জনপ্রিয় এখানে। ক্যানটন থেকে পিকিং রেলপথে যাবার সময় ট্রেনের কামরা থেকে দেখেছি যে চীনের ছেলেমেয়েরা পথের ধারের ষ্টেশনে ড্রিল করছে বাজনার সঙ্গে সঙ্গে। একজন উপদেষ্টাকে সেখানে দেখা গেল। চীনে আরো একটা বিশ্রী জিনিস ছিল। পথেঘাটে তরুণী মেয়েরা

বেরুলেই বখাটে ছেলেরা তাদের দেখে শীস দিত। আজ সে রকম দৃশ্য চীনে কল্পনাই করা যায় না। এখন সাংহাই, পিকিন, ক্যানটন সর্বত্র মেয়েরা নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করে, কেউ সাহস পায়না তাদের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বা তাদের প্রতি কোন অশোভন ইঙ্গিত করতে।

এই যে বিস্ময়কর নৈতিক উন্নতি এবং মানসিক সুস্থতা, শুনলাম, সম্ভব হয়েছে কোন আইন করে নয়, জেল-জরিমানা করে নয়, কেবল মাত্র শিক্ষার দ্বারা লোককে বুঝিয়ে দিয়ে। মানুষকে সুস্থ করে, সুন্দর করে গড়ে তোলার এই ব্যবস্থা দেখে নব্যচীনের সরকারের প্রতি আমার মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছিল। এর ফলে যুবকদের কর্মে এসেছে বিশ্বাস আর জীবনে নির্ভর।

পিকিংয়ের প্রেস ক্লাবে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখানে আমরা যখন প্রথম এসে পৌঁছাই তখন একদল চীনা সাংবাদিক আমাদের অভ্যর্থনা করেন। প্রেস ক্লাবে অন্যান্য বিদেশী সাংবাদিকরাও ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুজন ইংরেজকে দেখেছিলাম। রুশ সাংবাদিকরা ছিলেন অন্যত্র এক হোটেলে। প্রেস ক্লাবে থাকার একটা মস্ত বড় সুবিধে এই হয়েছিল যে টেলিগ্রাফ অফিসটি ছিল এরই সংলগ্ন। এখানকার কর্মচারীদের মধ্যে সবই দেখলাম মেয়ে এবং ইংরেজীতে তাদের খুব বেশী দখল না থাকা সত্ত্বেও এমন নিপুণভাবে তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল যে তা দেখে রীতিমত বিস্ময়বোধ করেছিলাম। প্রত্যেকটি টেলিগ্রাম নির্ভুল ভাবে পাঠান হয়েছিল।

পিকিংয়ে আসার পর থেকেই নব্য চীনের বৈশিষ্ট্য বেশী করে চোখে পড়ল। সেটি হলো চীনাদের বিনয়-নম্র ভাব, ইংরেজী করে বলতে গেলে বলতে হয়—'Charming modesty' এবং শ্রীনেহরু

পর্যন্ত চীনাদের এই চার্মিং মোভেস্মেন্ট দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। নম্র অথচ উৎসাহ উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ—এই হলো নব্য চীনের আদর্শ ছেলেমেয়ে। এই পাঁচ বছরে চীন কতখানি সাফল্য লাভ করেছে এ বিষয়ে চীনাদের কিছুমাত্র অহঙ্কার নেই। যখনই আমরা সাধারণ তন্ত্রী সরকারের কোন একটা উন্নয়ন মূলক প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছি, তখনই জবাব এসেছে—"হ্যাঁ, দেশ এগিয়ে চলেছে, এই পাঁচ বছরে আমরা কিছুটা এগিয়েছি, সামনে আরো অনেক কাজ। কিন্তু আপনাদের ভারতবর্ষ এর চেয়ে ঢের বেশী উন্নতি করেছে।" কলে কারখানায় শ্রমিকদের বিদ্যালয়ে—যেখানেই গেছি, নিরলস কর্মী দেখেছি, গর্বে স্ফীত একটি লোকও দেখিনি। নয়া চীনের এ রূপও কম বিস্ময়কর নয়।

চীনের বিনয়-নম্র মানসিকতার চমৎকার অভিব্যক্তি দেখেছিলাম 'পিপলস্ ডেলী' কাগজে। এই দৈনিক পত্রিকাখানি হলো কমিউনিষ্ট সংবাদপত্রের মধ্যে প্রধান। শ্রীনেহরু পিকিং আসার পর তাঁকে সম্বর্দনা জানিয়ে যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 'পিপলস্ ডেলী-তে প্রকাশিত হয়েছিল তার ভাব ভাষা ও ভঙ্গীতে দেদীপ্যমান ছিল একটা বিনয়-নম্রভাব। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর কাছে চীন সবিনয়ে তাঁর 'উপদেশ ও নির্দেশ' প্রার্থনা করছে—এই মর্মে সম্পাদকীয়টি লিখিত হয়েছিল। চীনের বিমান বাহিনীর যে প্লেনে করে আমরা পিকিং থেকে মাঞ্চুরিয়া আসা-যাওয়া করেছিলাম—তার 'এয়ার হোস্টেস্' বারবার আমাদের অনুরোধ করছিলেন 'Suggestion Book-এ আমরা যেন আমাদের অভিমত লিখতে ভুলে না যাই। কিন্তু এমন পরিপাটি ব্যবস্থার মধ্যে সামান্য মাত্র ত্রুটীও চোখে পড়ল না, যাতে করে কিছু suggest করা চলে। যখন আমাদের মধ্যে একজন লক্ষ্য করলেন যে প্লেনের ভেতরটা হঠাৎ অত্যন্ত বেশী গরম বোধ হচ্ছে, ভদ্র

মহিলা দেখলাম রীতিমত নার্ভাস হয়ে গেলেন এবং তাঁকে বুঝিয়ে বললেন যে, অন্যান্য যাত্রী ঠাণ্ডার জন্যে শঙ্কিত হয়েছেন বলে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমাদের একজন রিপোর্টারকে চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ-এন লাই একদিন জিজ্ঞাসা করলেনঃ "চীন সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?"

"আপনার এখানে যা কিছু দেখলাম, তাতেই আমি চমৎকৃত হয়েছি।"

"এ আপনার সহৃদয় ও সবিনয় উক্তি নিশ্চয়ই," বললেন চীনের প্রধান মন্ত্রীঃ "হয়ত আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো আপনাকে দেখান হয়নি।"

খাবার টেবিলেও দেখেছি, যাঁরা আমাদের পরিচর্যায় রত ছিলেন, তাঁরা কেবলই বলতেনঃ "এ আয়োজন অতি সামান্যই।" যদিও খাদ্যসম্ভারের সে আয়োজন ছিল রীতিমত রাজসিক। রসনাতৃপ্তিকর সেই সব খাদ্যের মধ্যে চিরদিন মনে থাকবে 'পিকিং ডাক্'। সাংহাইয়ের একটি সুবিখ্যাত রেস্তোরাঁর নাম 'পিকিং ডাক্'। এই রেস্তোরাঁর বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এইখানে একমাত্র হাঁসের মাংসের রকমারী সুখাদ্য তৈরী হয়ে থাকে। একই জিনিসের যে এত রকম ব্যঞ্জন তৈরী হতে পারে, তা একদিন বিকেলে এখানে এক ঘণ্টা কাটিয়ে আমরা উপলব্ধি করেছিলাম।

চীনাদের মনের পরিচয় আমাদের প্রধান মন্ত্রী দুটি সুন্দর বিশেষণে প্রকাশ করেছেন—'Sensitive and polite'; এবং এ যে অত্যুক্তি নয়, তা আমরা স্বচক্ষেই দেখে এসেছি। দেশ-পুনর্গঠনে ও বিবিধ শিল্প-সম্প্রাসরণের ব্যাপারে রাশিয়ার কাছ থেকে চীন যে সাহায্য পেয়েছে, তার জন্যে রাশিয়ার প্রতি চীনের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

কিন্তু এই বন্ধুত্বের জন্য কেউ যদি ইঙ্গিত করে যে, চীন সোভিয়েট ইউনিয়নের একান্ত মুখাপেক্ষী, তাহলে চীনারা তার প্রতিবাদ করতে ইতস্ততঃ করবেনা—এমনি তীক্ষ্ণ তাদের আত্মমর্যাদাবোধ।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত ১৪১টি উন্নয়ন কার্যের মধ্যে ৪১টি যে রাশিয়ার দান—এ বলতে তারা যেমন আনন্দবোধ করে, তেমনি যৌথ প্রচেষ্টার কতকগুলি যে শীঘ্রই পুরোপুরি চীনাদের কর্তৃত্বে আসবে, এর জন্যেও তারা কম গর্ব বোধ করে না। বর্তমানে চীনে রুশের সংখ্যা হবে খুব বেশী হ'লে ত্রিশ হাজার। এই ত্রিশ হাজার রুশ চীনের একাধিক কলকারখানার কাজে নিযুক্ত আছে এবং চীনের উত্তর অঞ্চলেই এদের বসবাস। দাইরেন, মুকদেন ও আনসানে রুশ কারিগররা তাদের নিজেদের কাজের গণ্ডীর মধ্যেই থাকে এবং চীনাদের সঙ্গে তাদের মেলামেশা অবাধ হলেও, তার মধ্যে রাজনীতি আদৌ স্থান পায় নি। এ ব্যবস্থা খুবই ভাল বলতে হবে। সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের অবশ্য এখানে খুবই খাতির এবং এর পেছনে আছে চীন ও রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। চীন কমিউনিস্ট দেশ। কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শিল্পপ্রচেষ্টা চীনে অবাধে চলছে। ছোটখাট শিল্পের সবই ব্যক্তিগত উদ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, রাশিয়ার মত সরকারী হস্তক্ষেপের লেশমাত্র নেই। এ ধরণের কমিউনিজম্ সত্যিই ভালো।

কিন্তু বিদেশী সাংবাদিকদের সম্বন্ধে চীনের উদারতার খুব বেশী প্রশংসা করতে পারিনে। যেসব ভারতীয় রিপোর্টার শ্রীনেহরুর চীন-ভ্রমণের সংবাদ সংগ্রহের জন্যে ভারতবর্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁরা কেউই সম্পাদক-শ্রেণীর লোক ছিলেন না বলে তাঁদের খাতির-যত্নে তেমন মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বলে মনে হ'লো না। খাওয়া-দাওয়ার যত্ন বলছি না, সাংবাদিক হিসেবে আমরা যে মর্যাদা

ভারতবর্ষে উপভোগ করি, চীনে তার অভাব দেখলাম। আমরা গিয়েছিলাম নিখিল-চীন সাংবাদিক সমিতির আমন্ত্রণে, কিন্তু সেই সমিতির প্রেসিডেণ্ট বা ভাইস-প্রেসিডেণ্ট সৌজন্যের খাতিরেও ভারতীয় রিপোর্টারদের সঙ্গে এক টেবিলে কখনও খেতে আসেন নি। একবার মাত্র এ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি এক মিনিটের জন্যে আমাদের দেখা দিয়ে গিয়েছিলেন, তাও কোন কথা না বলে।

এর একটা অবশ্য কারণ আছে। চীনে সংবাদপত্র গৌণ, সাংবাদিক আরো গৌণ। চীনের সমাজ-জীবনে, ভারতবর্ষের মত, সংবাদপত্রের প্রভাব বা গুরুত্ব নগণ্য বললেই হয়। তাই প্রত্যেকটি ভোজসভায় রিপোর্টারদের স্থান নির্দিষ্ট থাকত একেবারে পিছনে, যেখান থেকে সংবাদ লিপিবদ্ধ করা খুবই কঠিন। কিন্তু আমাদের প্রধান মন্ত্রী ও স্থানীয় রাষ্ট্রদূত যে ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন, তাতে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের স্থান ছিল সর্বাগ্রে। তারপর ভ্রমণের ব্যাপারেও আমরা খুব বেশী সুবিধা পাইনি। প্রধান মন্ত্রী, তাঁর দপ্তরের কর্মচারীরা, এমন কি বেয়ারা হরি পর্যন্ত যে সুবিধা পেয়েছে তার তুলনায় সাংবাদিকদের ভাগ্যে দুর্ভোগই জুটেছে বলতে হবে। তাঁরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণের জন্য রাশিয়ার 'জিপ্' গাড়ি ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছেন, আর আমাদের কপালে জুটেছে মোটর বাস্। পরে অবশ্য আমাদের অনুরোধে এ ব্যবস্থার বদল হয়েছিল এবং আমরা ছোট ছোট মোটর গাড়ি ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিলাম।

চীনাদের হাততালি প্রথাটা বেশ মজার। এটা উভয়তঃ ; অতিথি গৃহে প্রবেশ করলে গৃহস্থ হাততালি দিয়ে তাঁকে যেই অভ্যর্থনা করেন অমনি অতিথিও আনন্দে তাতে যোগদান করেন। পথিপার্শ্বের জনতা যখন কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য

হাততালি দেয়, অমনি তিনি হাততালি দিয়ে তাদের প্রতি-অভ্যর্থনা জানান। আমরা তাই খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যখন ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের ভোজসভায় অতর্কিতে প্রবেশ করে মিঃ মাও-সে-তুং আনন্দে হাততালি দিতে থাকেন। পরে আমাদেরও এই হাততালি দেওয়া অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

পিকিং-এ কর্মব্যস্ত পাঁচটি দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। রাতেও বিশ্রাম ছিলনা, কিন্তু তার জন্যে কোনো শারীরিক অবসাদ বা মানসিক ক্লান্তিও বোধ করিনি। সাংবাদিক জীবনে এও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সবচেয়ে প্রফুল্ল দেখেছি আমাদের প্রধান মন্ত্রীকে ; ভ্রমণের শেষে তাঁর চিকিৎসককে বরং ক্লান্ত দেখলাম, কিন্তু শ্রীনেহরুর স্বাস্থ্য এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। এত যে বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা, খানাপিনা, ঘুরে বেড়ান—কিছুতেই তাঁর ক্লান্তি ছিলনা, এমনি প্রাণোচ্ছল মানুষ শ্রীনেহরু। পিকিং-এ যে প্রতিষ্ঠানটি প্রধান মন্ত্রী খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখেন, সেটি হ'লো সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট ফর ন্যাশন্যাল মাইনরিটিজ। এটির কার্যাবলী তিনি খুব মনোযোগের সঙ্গেই দেখেছিলেন এবং ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য এ রকম একটা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাও তিনি স্বীকার করেন।

চীনে আর একটি আশ্চর্য জিনিস দেখে এলাম। সেটি হ'লো চীনের ছেলেমেয়ে। তারা কত সুখী, কেমন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা তাদের ; যুবক-যুবতীরা কি অদ্ভুত কর্মী, কেমন বুদ্ধিদীপ্ত, লক্ষ্যের অভিমুখে কিরূপ একাগ্র দৃষ্টি ! তারা তাদের নেতাদের কী প্রাণঢালা ভালবাসা জানায় ! আর, তাদের তরুণ প্রাণের চাহিদা মেটানোর দিকে তাদের নেতাদের আর সরকারের কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ! তাঁরা সারাক্ষণ তরুণদের কিসে উন্নতি হয়, সেই চিন্তাই করছেন ; প্রতিটি

কর্মে তাঁদের অন্তরের স্পর্শ পেয়ে জাগ্রত হচ্ছে, বিকশিত হচ্ছে নয়া চীনের তরুণ মন। শিক্ষা, খেলাধুলা ও জীবনের আনন্দ-ভাণ্ডারের সব দরজাই সেখানে উন্মুক্ত রয়েছে তরুণদের জন্য। মোট কথা, সমগ্র জাতি এক নতুন জীবনবোধে আনন্দিত। সেই আনন্দ দেখলাম তাদের একনিষ্ঠ কর্মসাধনায়, নৃত্যগীতে, খেলাধূলায় আর সমবায় জীবনযাপনের মধ্যে।

দেশের সর্বত্রই দেখলাম সরকার শিশু ও মাতৃজাতির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। খাদ্যসমস্যার সমাধান চীন সরকার করে ফেলেছেন, এখন গৃহসমস্যা-সমাধানের জন্য তাঁদের চেষ্টার অন্ত নেই। বেকার-সমস্যার সমাধান তো তাঁরা প্রায় করেই ফেলেছেন, এমন কি কৃষি, শিল্প, শিক্ষা—সর্বক্ষেত্রেই সুশিক্ষিত সুযোগ্য কর্মীর জন্য এখনও অনেক স্থান অপূর্ণ রয়েছে। সকল কর্মীর মধ্যেই রয়েছে আধুনিকতম কলা-কৌশল শিক্ষা করে দেশকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার অবিরাম চেষ্টা। কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পাশে নারী এসে দাঁড়িয়েছে সেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে। এ অধিকার তারা পেয়েছে তাদের শাসনতন্ত্র থেকে।

চীনে আর একটা জিনিস দেখবার আগ্রহ আমাদের ছিল। সেটি হলো 'পিপলস্ কোর্ট' অর্থাৎ জনগণের আদালত। নয়া চীনের এ এক নতুন কীর্তি। পিকিংয়ে একদিন আমরা প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর কন্যার সঙ্গে এই রকম একটা আদালতের কাজ দেখতে গেলাম। ছোট অথচ পরিচ্ছন্ন আদালতগৃহের মধ্যে প্রবেশ করার পর রেজিষ্ট্রার আমাদের সেদিনের মামলাটি বুঝিয়ে দিলেন। এটা ছিল একটি বিবাহবিচ্ছেদের মামলা। বিচ্ছেদপ্রার্থী স্বামীর অভিযোগ ছিল এই যে, খুব ছেলেবেলায় তার অমতে তার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে তার কিছুতেই বনিবনা হয় না। নিম্ন আদালতে তার প্রথম আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়েছে এবং

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা বোঝাপড়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই হ'লো এ ধরণের মামলার সাধারণ রীতি। চীনে কোন উকীল নেই, তবে আবেদনকারী ও প্রতিবাদীরা তাদের নিজের নিজের পক্ষ সমর্থন করতে পারে কিংবা তাদের কোন আত্মীয় বা বন্ধুকে প্রতিনিধিস্থানীয় করে মামলা পরিচালনা করতে পারে। এই মামলাটিতে দেখলাম বিচ্ছেদপ্রার্থীর স্ত্রীর পক্ষে দাঁড়িয়েছেন তাঁর এক আত্মীয়া তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে। তিনি বললেন—আবেদনকারীর বক্তব্য ভুল। আসলে তিনিই তাঁর স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত নন। মামলার শেষ পর্যন্ত আমরা ছিলাম না, তবে যেটুকু সময় ছিলাম, তার মধ্যেই চীনের আইন-আদালতের চেহারাটা কিছু দেখে নিয়েছিলাম। আদালতে বিচারকের আসনে তিনটি মহিলাকে দেখেছিলাম।

এবারকার ভ্রমণের সবচেয়ে বড় লাভ হলো যে, আমরা সাধারণতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপ্রধান মিঃ মাও-সে-তুংকে খুব কাছাকাছি দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। নয়া চীনের রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে মর্যাদা অনুসারে শীর্ষস্থানীয় হলেন চারজন—মাও-সে-তুং, জেনারেল চু-তে, লিউ সাচী ও চৌ-এন-লাই। মাও-সে-তুং চেয়ারম্যান হিসেবেই শুধু বড় নন, চীনে তাঁর প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব অসামান্য। চীনের প্রত্যেক গৃহে, অফিসে, কারখানারও মধ্যে মাও-সে-তুংয়ের প্রতিকৃতি আছে। স্বাধীনতা-লাভের বার্ষিক উৎসবের দিনটি ছাড়া জনসাধারণ ক্বচিৎ তাঁকে প্রকাশ্যে দেখতে পায়।

আমাদের রাষ্ট্রদূতের ভোজসভায় মিঃ মাও-সে-তুং ও আমার টেবিলের মধ্যে ব্যবধান ছিল তিন হাতেরও কম। এই জন্যেই আমি তাঁকে খুব সামনা-সামনি দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁর সহকর্মীদের তুলনায় মাও-সে-তুং এক বিরাট সুপুরুষ, যাকে

বলা যেতে পারে, "massive figure" এবং আমাদের প্রধান মন্ত্রীর চেয়ে দৈর্ঘে খাটো হলেও আয়তনে মাও-ই শ্রেষ্ঠ। চীনের এই পয়লা নম্বরের মানুষটির সঙ্গে আলাপ করার পর ভারতের প্রধান মন্ত্রী তাঁর সম্পর্কে আমাদের বলেন—"যেমন শক্তিমান, তেমনি মধুর প্রকৃতির মানুষ।" এ বিশেষণ মাও-সে-তুং সম্পর্কে বর্ণে বর্ণে সত্য। ভদ্রলোক খুব ধূমপান করেন—যাকে বলে chain smoker আর সে সিগারেট তাঁর নিজের দেশের তৈরী। স্বাদে ও গন্ধে চীনের সিগারেট সত্যিই উপাদেয়। তাঁর বাঁ দিকের থুতনীতে জরুলটি লক্ষ্য করলাম। মাও-সে-তুংয়ের বহু প্রতিকৃতিতে ও মর্মরমূর্তিতে এই জরুলটি স্থান পেয়েছে। কিন্তু কাছে বসে দেখলাম শিল্পীরা ওটি যেভাবে দেখিয়েছেন, আসলে জরুলটি অত বড় নয়। জেনারেল চু-তে ছিলেন অষ্টম রুট্ আর্মির অধিনায়ক, এখন তিনি মাও-সে-তুংয়ের ডেপুটি আর লিউ সাচী হলেন চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রকৃত পরিচালক। এঁরা তুজনেই বেশ ভদ্র ও বিনয়ী। খাঁটি সৈনিকের মতন জেনারেল চু-তে খুব কম কথাই বলেন। তবে আমরা সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলাম চৌ-এন-লাইকে দেখে। আমাদের প্রধান মন্ত্রীর মতই তাঁর উদ্যম ও অস্থিরতা আমাদের মুগ্ধ করেছিল। লোকটি যেন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের একটি চিত্তাকর্ষক বিগ্রহ—যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তেমনি কৌতুকপ্রবণ। প্রথম জীবনে তিনি রঙ্গমঞ্চের একজন বিখ্যাত অভিনেতা ছিলেন। আজো নব্যচীনের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে চৌ-এন-লাই জাতিগঠনের ও দেশ-উন্নয়নের এক বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ এবং এখানেও তাঁর সাফল্য সুনিশ্চিত।

বারো

উপসংহার

উপসংহারে মাত্র একটি কথাই বলার আছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী এই যে চীন ঘুরে এলেন—এই যে ঐতিহাসিক ভ্রমণ, এর সার্থকতা কোথায়? চীন থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে শ্রীনেহরু কলকাতায় এক বিরাট জনসমাবেশের সামনে তাঁর চীন-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা সর্বপ্রথম বর্ণনা করবার সময় বলেছেন—"আমার এই ভ্রমণ ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক এই কারণে নয় যে, আমি ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। চীন সরকারের আমন্ত্রণে আমার চীন-যাত্রাটাই ঐতিহাসিক, কেন না, সারা এশিয়ায় এর ঐতিহাসিক প্রভাব পড়তে বাধ্য—এমন কি সমগ্র পৃথিবীতেও। বহুকাল থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল, এশিয়ার প্রাচীন দেশগুলি প্রত্যক্ষ করি। দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি, এইসব প্রাচীন দেশে এখনও ভারতীয় সভ্যতার এমন সব চিহ্ন রয়েছে, যা ভারতবর্ষেও দুর্লভ। কাম্বোজ প্রভৃতি স্থানে যেসব নিদর্শন রয়েছে, তাতে শক্তি, চাতুর্য ও নৈপুণ্যের উজ্জ্বল পরিচয় বিদ্যমান। ভারতবর্ষকে চিনতে হলেও ভারতের বাইরে গিয়ে দেখতে হয় ভারতবর্ষ কি ছিল। ভারতবর্ষ থেকে ঐসব দেশে বাণিজ্য গিয়েছে, ধর্ম গিয়েছে, সভ্যতা গিয়েছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা হয়েছে। এদের সঙ্গে কখনও চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী যায় নি।

"ভারতবর্ষ ও চীন—এই দুই প্রাচীন দেশের সম্বন্ধ দু হাজার বছরেরও পুরানো, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে এই দুইটি দেশ

কখনও যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আরো যেসব ছোট বড় দেশ আছে, তাদের ওপর এই দুই বৃহৎ দেশের প্রভাব পড়েছে। তবু কোন সংঘর্ষ হয়নি। ঐসব ছোট বড় দেশের জনসাধারণ চীনের সভ্যতাও গ্রহণ করেছে, ভারতের সভ্যতাও গ্রহণ করেছে। অথচ এই দুই সভ্যতা বন্দুক-তলোয়ারের সাহায্যে বিস্তার লাভ করেনি।

"এই যে বিরাট এশিয়া, এরই অন্তর্গত চীনদেশকে বিশেষ করে জানতে গিয়েছিলাম। একদিন আমার জীবনে আমি ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করতে বেরিয়েছিলাম। আপাতদৃষ্টিতে এখানে কি আছে?—না মানুষ। এই মানুষের কি অবস্থা, এদের মতিগতি কোন্ দিকে, প্রাচীন ইতিহাস থেকে তা উপলব্ধির চেষ্টা করি। কিন্তু সেই প্রচেষ্টায় এই উপলব্ধি করেছি যে, ভারতবর্ষ বড় গভীর, বড় বিরাট, একে সমগ্রভাবে বুঝতে পারা বড় কঠিন। বিচিত্র এর রূপ। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। দীর্ঘকাল পরশাসনে থাকার জন্যে চীন, ইন্দোনেশিয়া অথবা ইরাণে কি আছে তা আমরা বিশেষ জানবার সুযোগ পেতাম না। কেননা, ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের এই প্রতিবেশী দেশগুলির কোন সম্বন্ধ ছিল না। আজ স্বাধীন হবার পর আমাদের দৃষ্টি আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির ওপর পড়েছে। তাই প্রতিবেশীদের চিনতে শুরু করলাম।

"এশিয়ার এখন পরিবর্তন ঘটছে। এই মহাদেশের এক বিরাট অংশ পরশাসিত ছিল এবং স্থবিরের মতো হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আজ তার শক্তির পুনরভ্যুত্থান হয়েছে। চীন ও ভারত দুই দেশের পিছনেই হাজার বছরের একটি পুরাতন ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসে ভারত ও চীনের সাংস্কৃতিক বন্ধন কিন্তু ছিন্ন হয়নি। এই

প্রাচীন দেশ সম্বন্ধে দশ দিন ঘুরে কিছু বলা কঠিন। প্রাণভরে দেখে এলাম একটা জাগ্রত জাতির উৎসাহ-উদ্দীপনা। চীনের নিয়মানুবর্তিতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা দেখবার জিনিস। যে কোন জাতির পক্ষেই এ দুটি বড় হাতিয়ার; এর বলেই চীন স্বাধীনতা অর্জন করেছে। চীনের জনতা, যুবসমাজ, ছাত্রছাত্রী—সকলের মধ্যে দেখলাম নিয়মানুবর্তিতার বিপুল শক্তি বিদ্যমান। চীনাদের কাছে আমরা এই নিয়মানুবর্তিতা শিখতে পারি।”

মহাচীন-ভ্রমণে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গী হয়ে দেখলাম তাঁর উদার দৃষ্টি সংকীর্ণ ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে দেখেছে এশিয়া মহাদেশকে, চেয়েছে প্রত্যেকটি দেশকে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের নিবিড় বন্ধনে গ্রথিত করতে। আজকের চীনের প্রকৃত চেহারার একটা বাস্তব পরিচয় নিয়ে তিনি ভারতে ফিরেছেন; আবার সেই সঙ্গে অতীতের পথেও বিচরণ করে প্রাচীনকালের চীনকেও দেখে এসেছেন। এই দুই দেখার ভেতর দিয়েই তিনি চীন ও ভারতের মধ্যে সংস্কৃতির নিবিড় যোগসূত্র-স্থাপনের ইতিহাস নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। তাঁর চীন-ভ্রমণের সার্থকতা এইখানেই। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি একদা চীনের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, যে প্রভাব সম্প্রসারিত হয়েছিল দ্বীপময় ভারতের পরিধির পরপারে, তারই শত সহস্র চিহ্ন আজও বিদ্যমান দেখে এলাম চীন ও কাম্বোডিয়ার পথেপ্রান্তরে, দুই দেশের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের স্তরে স্তরে। এই পুরাতন সম্পর্ক-সূত্র আজ নতুন করে সৌহার্দ্যের বন্ধনে চীন ও ভারতকে বাঁধবে, এই আশা নিয়েই প্রধান মন্ত্রী ভারতে ফিরেছেন। প্রধান মন্ত্রীকে উপলক্ষ্য করে চীন আজ অভিনন্দন জানিয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির সেই সনাতন সত্তাকে, একদিন যা চীন ও ভারতের মাঝখানে রচনা করেছিল সংযোগের সেতু, সম্পর্কের সূত্র। নেহরুর

চীন-আবিষ্কারের এই হ'লো সত্যকার স্বরূপ। চীন এসে একদিন ভারতের সঙ্গে মিলবে—আমরাও এই আশা নিয়েই ফিরেছি।

* * *

সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতা-বিড়ম্বিত এশিয়ার নতুন জয়-যাত্রার ইতিহাসে শ্রীনেহরুর চীন-ভ্রমণ সমসাময়িক কালের একটা বিশেষ ঘটনা। শুধু শ্রদ্ধা, সম্মান এবং আদর-আপ্যায়নেই প্রধান মন্ত্রীর এই ঐতিহাসিক ভ্রমণ সীমাবদ্ধ থাকেনি—চীন ও ভারত পরস্পর হাত ধরাধরি করে যাতে শান্তি, কল্যাণ ও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে, যাতে এশিয়ার মৃত্তিকা থেকে ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব কিংবা বাণিজ্যিক একাধিকার চিরতরে উন্মূলিত হয়, এবং নতুন এশিয়ার ছোট বড় সকল দেশ যাতে কেউ কারো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে বা কারো বৈশিষ্ট্য বা সার্বভৌমতা ক্ষুণ্ণ না করে এক ঐক্যের পরিমণ্ডলে শান্তির সঙ্গে বাস করতে পারে, তারই প্রাথমিক প্রস্তুতি এই ঐতিহাসিক ভ্রমণ। এই অবস্থার অনুকূলে প্রধান মন্ত্রী চীন রাষ্ট্রের প্রধানদের সঙ্গে নিশ্চয়ই আলোচনা করেছেন, যদিও তাঁর কোন বক্তৃতায় একথা প্রকাশ পায় নি। সাংস্কৃতিক স্তর থেকে রাজনীতির স্তরে আলোচনা নিশ্চয়ই হয়ে থাকবে, কেননা, বর্তমান সংকটময় সময়ের পটভূমিতে এশিয়ার শান্তি ও সংহতির প্রশ্নকে যে বাদ দিয়ে রাখা হয় নি, এর আভাস প্রধান মন্ত্রীর অনেক কথার মধ্যেই আমরা পেয়েছিলাম। জ্ঞানের প্রদীপ ও শিল্পের রসসম্পদ হাতে নিয়ে অতীতে ভারতবর্ষ যেমন অন্য দেশে গিয়েছিল, আজ তেমনি তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক প্রতিভার সম্পদ নিয়ে ভারতের প্রধান মন্ত্রী চীনে গিয়েছিলেন, সামগ্রিক কল্যাণের পথে একযোগে চলার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে।

নেহরুর চীন-ভ্রমণ চীন-ভারত মৈত্রীর পথ প্রশস্ত করে দিল। নিঃসন্দেহে এশিয়ায় আজ নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী। এই দশ দিনের ভ্রমণ আগামী বহুদিনের পক্ষে এক নতুন যুগের অবতারণা করল। চীন-ভারত শুধু প্রাচীনতম সভ্যতারই গৌরবময় অধিকারী নয়, আধুনিক কালের দুর্ভাগ্যের ইতিহাসের দিক দিয়েও দুই দেশের মধ্যে রয়েছে সমগোত্রতা। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্বের দুরপনেয় কলঙ্ক থেকে চীন ও ভারত আজ মুক্ত। নতুন সমাজ ও নতুন গণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নেহরু-মাও আজ যে শুভযাত্রা শুরু করেছেন, তা এশিয়ার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলো। যে ঐতিহাসিক পঞ্চনীতি রাজধানী দিল্লী থেকে চৌ-নেহরু মিলনের পর ঘোষিত হয়েছিল, তা শুধু ভারত ও চীনের বন্ধুত্বের ভিত্তি নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য-স্থাপন এবং যুদ্ধ-নিবারণের পক্ষে একটা নতুন পথের মতো। দিল্লী-পিকিং-এর এই পথ দিয়েই আসবে এশিয়ার নতুন অভ্যুদয়। আন্তর্জাতিক ঘটনার গতিপথে বহু বিষয়ে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও, আজ চীন ও ভারত যে একত্র মিলিত হতে পেরেছে—নেহরুর ঐতিহাসিক ভ্রমণ সেই মিলনকেই স্থায়িত্বের পথে নিয়ে যাবে।

প্রধান মন্ত্রীর চীন-ভ্রমণের ভেতর দিয়ে দুটো জিনিস আজ আমাদের কাছে পরিস্ফুট হ'লো। এখনকার চীন প্রকৃতপক্ষে শান্তিবাদী, কোন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতে তার ইচ্ছে নেই—এ বিষয়ে শ্রীনেহরু একেবারে নিঃসন্দেহ। রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ সংগ্রামের পর আজ সারা চীন জুড়ে চলেছে ব্যাপক সংগঠন ও উন্নয়ন-কার্য। এর অবাধ অগ্রগতির প্রয়োজনেই চীনের নেতৃবর্গ আজ যুদ্ধকে এড়িয়ে যেতে চান। দ্বিতীয় সত্য হ'লো—এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে

চীনাদের আত্মসচেতনতা। সাম্যবাদী হয়েও চীন তার এশিয়া-স্থলভ মনোবৃত্তি বহুলাংশে অক্ষুণ্ণ রেখেছে—শ্রীনেহরুর তাই অভিজ্ঞতা। যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহ-অস্তিত্বের কামনা নিয়ে তিনি চীন ঘুরে এলেন, এ দুটো কারণেই তা সহজতর হবে—এই তাঁর বিশ্বাস। ভারতের আদর্শবাদ, শান্তি ও মৈত্রীর বাণী-প্রচারের ফলে এশিয়ার রাজনীতিতে ভারতের মর্যাদা বর্তমানে বাড়লো—প্রধান মন্ত্রীর চীন-ভ্রমণের এই প্রত্যক্ষ ফল।

এশিয়ার ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ আজ সত্যই এশিয়াবাসীর হাতে। এশিয়ার বন্দরে শহরে জনপদে আজ শুধু এশিয়াবাসীর নিরঙ্কুশ আধিপত্য ও অধিকার। আজ সত্যই এশিয়ার ইতিহাসের মোড় ঘুরেছে। ভারতবর্ষ ও চীন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সগর্বে হিমালয়ের মতো এবং হিমাদ্রি-শৃঙ্গে সূর্যের আলো পড়বার মতই ভারত-চীনের নবজীবনচ্ছটা স্বর্ণাভা বিস্তার করেছে। এই নতুন সূর্যোদয়ের অগ্রদূত—ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু। তাঁর চীন-যাত্রা জীবনের এই নবসূর্যোদয়ের বন্দনা, পুরাতন এশিয়ার নবতম সমাজতান্ত্রিক জয়যাত্রার বলিষ্ঠ নিশানা। দিল্লী থেকে পিকিং—এই দীর্ঘপথ আজ নতুন গণতন্ত্রের ঐক্যতানে মুখরিত। কিন্তু রাজনৈতিক মতবাদের জটিল ও কুটিল আবর্তের উর্ধ্বে মানুষের যে মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, শ্রীনেহরুর চীন-পরিদর্শনে তারই প্রাণপূর্ণ স্পর্শ সম্প্রসারিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট—এক

চীন পরিভ্রমণান্তে কলিকাতায় বিরাট জনসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ভাষণ

চীন ও ভারতের শান্তির নীতি সারা বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করিবে

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু এক পক্ষকাল চীন পরিভ্রমণ শেষ ক'রে গত মঙ্গলবার কলিকাতায় ফিরে আসেন। ঐদিন তিনি ময়দানে অনুষ্ঠিত প্রায় ১০ লক্ষ নরনারীর এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন। ভারতভূমিতে প্রত্যাবর্তনের পর এইটিই তাঁর প্রথম ভাষণ।

শ্রীনেহরু সুউচ্চ বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করিলে বিপুল জনমণ্ডলী উচ্ছ্বসিত হর্ষধ্বনিতে তাঁকে স্বাগত জানায়।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায় প্রধান মন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, প্রধান মন্ত্রী ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতারূপে চীনে গিয়েছিলেন। তাঁর এই ভ্রমণের পিছনে গভীর তাৎপর্য রয়েছে। শ্রীনেহরু আজ আমাদের যা বলবেন তা তাঁর ব্যক্তিগত কিছু নয়, এই দেশের মুখপাত্র হিসাবেই তা তিনি বলবেন। তিনি আমাদের যেভাবে চলতে বলবেন, আশা করি আমরা তাঁর সেই কথামত চলতে পারবো।

শ্রীনেহেরু হিন্দীতে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিটকাল ভাষণ দেন।

শ্রীনেহরুর ভাষণ ঃ

প্রধান মন্ত্রী বলেন, '১৫ দিন চীন ও দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ার কিছু কিছু অংশে ভ্রমণ ক'রে নিজের দেশের আপনার জনের মধ্যে ফিরে এসে আমি আনন্দ অনুভব করছি। চীনে যাওয়ার সময় কলিকাতায় আমি সাংবাদিকদের বলেছিলাম যে, আমার চীন-যাত্রা এক 'ঐতিহাসিক' ঘটনা। চীন-সফর শেষেও আমি একে ঐতিহাসিক ঘটনা ব'লেই অভিহিত করব। পুঁথিপত্র পাঠ ক'রে কোন দেশকে যতটুকু জানা যায়, প্রত্যক্ষ দেখা ও জনগণের সঙ্গে মেলামেশায় সেই দেশকে তার থেকে বেশি চেনা যায়। বহুকাল থেকেই আমার এসিয়ার প্রাচীন দেশগুলি দেখার ইচ্ছা ছিল। দেখে বিস্মিতও হয়েছি যে, ঐসব প্রাচীন দেশে এখনও ভারতীয় সভ্যতার এমনসব চিহ্ন আছে যা ভারতবর্ষে দুর্লভ। ভারতবর্ষ থেকে ঐসব দেশে বাণিজ্য গিয়েছে, ধর্ম গিয়েছে, সভ্যতা গিয়েছে, ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা হয়েছে। কিন্তু এদের সঙ্গে কখনও কোন সেনাবাহিনী যায় নি।

চীন-ভারত সম্পর্ক ঃ

'ভারতবর্ষ ও চীনের সম্বন্ধ দু'হাজার বৎসরের পুরোনো কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে কখনও এই দুই দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হয় নি। দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় আরো যেসব ছোটবড় দেশ আছে সেগুলির উপর এই দুই দেশের প্রভাব পড়েছে। ঐসব ছোট-বড় দেশের জনগণ চীনের সভ্যতাও গ্রহণ করেছে, ভারতের সভ্যতাও গ্রহণ করেছে। অথচ এই দুই সভ্যতা বন্দুক-তলোয়ারের সাহায্যে বিস্তারলাভ করে নি।

'ভারতবর্ষ পরাধীন থাকা কালে পূর্বভাগের প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল না। সম্বন্ধ ছিল পাশ্চাত্ত্য দেশের সঙ্গে। এ দেশের শিক্ষিত সমাজ ইউরোপীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিত; কিন্তু চীন, ইন্দোনেশিয়া অথবা ইরানে কী আছে, তার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নয়। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই; কোন দেশ পরশাসিত হ'লে এইরকমই হয়। কিন্তু আজ যখন আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে, তখন আমাদের দৃষ্টি প্রতিবেশী দেশগুলির উপর পড়া বাঞ্ছনীয়।

এশিয়ার নবজাগরণ ঃ

'বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এশিয়ার পরিবর্তন ঘটেছে। এই মহাদেশের এক বিরাট অংশ পরশাসিত ছিল, কিন্তু আজ আবার তার শক্তির পুনরভ্যুত্থান হয়েছে। পরশাসনে অগ্রগতি হয় নি ব'লে ঐসব দেশে বহু সমস্যা জ'মে উঠেছিল। পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সেইসব সমস্যা-সমাধানের প্রশ্ন দেখা দেয়।

'এক এক দেশের ইতিহাস এক এক রকমের। সমস্ত আন্দোলনের পিছনে এই ইতিহাস ক্রিয়াশীল হয়। এই ইতিহাসই দেশের জনসাধারণকে তদনুযায়ী গ'ড়ে তোলে। ভারতবাসীরা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ও তাঁর প্রদর্শিত পথে স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছে এবং দেশবাসী সেই ধাঁচেই গ'ড়ে উঠেছে। কিন্তু এই ধারাতেই অন্য দেশ আন্দোলন করুক—এমন দাবি করা আমাদের পক্ষে সমীচীন নয়। আমাদের কাউকে একথা বলার অধিকার নেই যে, তোমরা আমাদের পথ অবলম্বন কর। তেমনি অপরেরও আমাদের বলার অধিকার নেই যে, তোমরা এইভাবে চল। তবে একথা ঠিক যে, একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ করবে।

আধুনিক জগৎকে বিজ্ঞানেরই জগৎ বলা হয়। সেই বিজ্ঞান আমাদের অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে। কিন্তু তার অর্থ অন্ধ অনুকরণ নয় ; কেন না, অনুকরণ ক'রে কেউ এগিয়ে যেতে পারে না। নতুন ভারতবর্ষ গ'ড়ে তুলতে হ'লে বিজ্ঞানের বনিয়াদ চাই।

চীনে অভ্যর্থনা :

'চীন ও ভারত উভয় দেশের পিছনেই হাজার হাজার বছরের পুরোনো ইতিহাস আছে। চীনের মত প্রাচীন দেশ দশদিন পর্যটন ক'রে তার সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন। আমি গ্রামাঞ্চলে যেতে পারি নি। বড় বড় শহরে গিয়েছি। লক্ষ লক্ষ লোক দেখেছি। শুধু দেখে কিছু বোঝা মুশকিল ; কারণ, আমার ধারণা, চীনা ভাষাই তার প্রধান বাধা। চীনা ভাষা বড় কঠিন। তবু তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করেছি। আপনারা আমাকে যেভাবে ভালবেসে অভ্যর্থনা জানিয়ে থাকেন, তাঁরাও আমাকে সেইভাবে অভ্যর্থনা করেছেন। চীনের সরকার আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু সেই আমন্ত্রণ যেন জনসাধারণই করেছিলেন। ছাত্রছাত্রী, যুবক-যুবতী সকলেই সমানভাবে প্রীতি প্রকাশ করেছে। আমি একবার ভেবেছি, তারা আমাকে এত উৎসাহে অভ্যর্থনা জানালো কেন? এ সম্বন্ধে যা উপলব্ধি করেছি, তা হচ্ছে এই যে, তারা অভ্যর্থনা জানিয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে, ভারতকে—ব্যক্তিগতভাবে আমাকে নয়।

চীন-ভারত মৈত্রী :

'আমার ইচ্ছা চীনের সঙ্গে আমাদের মিত্রতা হয়। এশিয়ার এই দুই দেশের মিত্রতা আবশ্যক। উভয় দেশের অভ্যন্তরীণ

নীতি পৃথক হ'লেও এই দুই দেশের মিত্রতা দরকার। তা হ'লে সমগ্র এশিয়ার উপর তার প্রভাব পড়বে। আমি লক্ষ্য করেছি, ওখানকার জনতা এই মিত্রতা চায়। ওদের আশা আমার চিত্ত স্পর্শ করেছে।

চীনাদের নিয়মানুবর্তিতা ঃ

'চীনের জনতার যে সংগঠন, যে উৎসাহ আমি দেখেছি, তার মূলে রয়েছে নিয়মানুবর্তিতা। যে-কোন জাতির পক্ষে এ এক মস্ত হাতিয়ার। আণবিক বোমা প্রভৃতি একরকম শক্তি বটে, কিন্তু জনসাধারণের নিয়মানুবর্তিতাই জাতির মূল শক্তি। চীনের ছাত্রছাত্রী ও যুবসমাজের মধ্যে এই নিয়মানুবর্তিতার বিপুল শক্তি বিদ্যমান। আমাদের সংগ্রামকালেও আমরা নিয়মানুবর্তিতা পালন করেছি। চীনে স্টেশনে ও রাস্তায় জনতাকে লক্ষ্য করেছি, তারা এক পাও নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে নি। আমাদের ছাত্র-সমাজেরও এইরকম নিয়মানুবর্তিতা পালন করা উচিত।

চীন সরকার যুদ্ধ চান না ঃ

'আজ আমাদের সম্মুখে মস্ত বড় কাজ—দারিদ্র্য ও কর্মাভাব দূর করা। কঠিন সমস্যা। এর সমাধানের জন্য প্রথম পাঁচসালার পর দ্বিতীয়, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার দরকার হবে। চীনেও সেই একই সমস্যা। তাঁদেরও পাঁচসালা পরিকল্পনা একটি নয়, কয়েকটির দরকার হবে ব'লে তাঁরা মনে করেন। কারণ, যাদুবলে কোন দেশের কোন উন্নতি হয় না, তা সে দেশ যে নীতিই অনুসরণ করুক। নীতি সমাজবাদী হোক বা সাম্যবাদী হোক,

আসল কথা কাজ এবং ঠিক পথে চলা। সামান্য পার্থক্য থাকলেও চীন ও ভারতের সমস্যা মোটামুটি একই রকমের।

'চীন ও ভারতের মিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখা একান্ত দরকার। ছুনিয়ায় যদি লড়াই বাধে, তা হ'লে কোন কল্যাণই হবে না। আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি তাদের বলেছি যে, ভারত আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করবে না। আমরা যুদ্ধ-বিরোধী। যুদ্ধের ফলে কোন কিছুর সুরাহা হয় ব'লে আমি বিশ্বাস করি না। দেশের উন্নতি ব্যাহত হবে ব'লে আমাদের মত চীনও যুদ্ধের বিরোধী। আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, চীনের সরকার ও জনসাধারণ যুদ্ধ চান না।

ভারতের 'পঞ্চশীল' বা পঞ্চনীতি ঃ

'এশিয়ায় শান্তিরক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যদি শান্তির পক্ষে থাকে, তবে তার প্রভাব সমস্ত পৃথিবীতে পড়তে বাধ্য। চীন ও ভারতের 'পঞ্চশীল' সর্বতোভাবে সঠিক নীতি। ভারতের পক্ষে আপাতত এই-ই যথেষ্ট। ভবিষ্যতে কী হবে, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। ভরসা থেকেই ভরসা আসে, প্রেম থেকেই প্রেমের সঞ্চার হয়।

চীনের শাসনপদ্ধতি ঃ

'চীনের শাসনপদ্ধতি এককেন্দ্রিক। ভারত যেমন শাসনপদ্ধতির দিক থেকে দ্বিখণ্ড—কেন্দ্রে ও প্রদেশে খণ্ড খণ্ড শাসনব্যবস্থা—চীনে তেমন নয়, চীনের শাসন সর্বতোভাবে কেন্দ্রায়ত্ত। উপর থেকে নিচু পর্যন্ত শাসনব্যবস্থা এক কেন্দ্রাধীন। এতে শক্তি পাওয়া যায় এবং সামর্থ্যের সঙ্গে সকল সমস্যার মোকাবিলা করা সহজ হয়। আমি অবশ্য চাই যে, গ্রামে গ্রামেও শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র থাক। যা হোক, চীনের শাসনপদ্ধতি আমাদের থেকে পৃথক।

'ভারতে প্রাদেশিকতা, বর্ণভেদ, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি সমস্যা আমাদের জাতিকে অবনত করেছে। সকলকে সমান সুযোগ দিতে নিশ্চয়ই হবে। রাজনৈতিক দিক থেকে সকলকে সমান ক'রে দেওয়া হয়েছে। এখন আর্থিক দিক দিয়ে সকলকে সমান করতে হবে, আর করতে হবে সামাজিক দিক দিয়ে।

'চীনে প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা বা জাতিভেদের সমস্যা নেই। সেখানে অনেক ধর্মাবলম্বী আছে, কিন্তু কে কোন্ ধর্মাবলম্বী, তা বাইরে থেকে দেখে বলা মুশকিল। তাই আমার মনে হয়, কারো কোন প্রাদেশিক পরিচয় অপেক্ষা ভারতীয় পরিচয় অনেক বড় কথা।

আমাদের কাম্য ঃ

'পৃথিবীতে শান্তিরক্ষাই আমাদের কাম্য। বিশেষ ক'রে এশিয়ায় যাতে শান্তি বজায় থাকে, তা-ই আমরা চাই।

'ইন্দোচীনে তিনটি আন্তর্জাতিক কমিশনের চেয়ারম্যানই ভারত। এই কাজে ভারতীয়রা প্রশংসাও অর্জন করেছে। এজন্য আমি গর্বানুভব ক'রে থাকি। এতে ভারতের সমাদর বৃদ্ধি পেয়েছে।'

পরিশিষ্ট—দুই

ভারত ও চীনের মধ্যে প্রথম বাণিজ্যচুক্তি

ঐতিহাসিক ঘটনাবর্তের মধ্যে ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৫৪ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন-লাই ভারতে প্রথম পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা সুরু হয়। তার পর ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুর চীন-যাত্রার প্রাক্কালে ১৪ই অক্টোবর নয়াদিল্লীতে ভারত ও চীনের মধ্যে প্রথম বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এই চুক্তি প্রথমে দুই বৎসরের জন্য চালু থাকবে। ভারত ও চীনের সরকার এবং জনসাধারণের বন্ধুত্ব দৃঢ়তর করা এবং সমমর্যাদা ও পারস্পারিক কল্যাণের ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিস্তারসাধনই এই চুক্তির উদ্দেশ্য। এই চুক্তি অনুসারে ভারতীয় মুদ্রায় মূল্য পরিশোধ করতে পারা যাবে এবং এর পরেও যদি কিছু দেনা-পাওনা বাকী থাকে, তা হ'লে তা স্টার্লিংয়ে পরিশোধ করা যেতে পারবে।

ভারতের পক্ষে বাণিজ্য ও শিল্পদপ্তরের সেক্রেটারি শ্রী এইচ, ভি, আর, আয়েঙ্গার এবং চীনের পক্ষে চীনা বৈদেশিক বাণিজ্যদপ্তরের মিঃ কুং ইউয়ান চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। দুই দেশের মধ্যে যে-সব পণ্যের আমদানি ও রপ্তানি করতে পারা যাবে, চুক্তিপত্রের সঙ্গে সংযোজিত তালিকায় তার উল্লেখ করা হয়েছে।

এই চুক্তি অনুসারে ভারত থেকে চীন দেশে চাল, ডাল, তামাক, ধাতুপিণ্ড, উদ্ভিজ্জ তৈল, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম, নানাবিধ যন্ত্র, লৌহ ও লৌহজাত দ্রব্যাদি, সূতী কাপড়, পাটজাত দ্রব্য, সাইকেল, মোটরগাড়ী, সিমেণ্ট, টায়ার ও টিউব, হ্যারিকেন লণ্ঠন, সেলাই কল, অভ্র ও ভারতীয় ফিল্ম রপ্তানী করতে পারা যাবে।

চীন থেকে ভারতে আমদানী করতে পারা যাবে এই জিনিসগুলি: চাল, সোয়াবীন, যন্ত্রপাতি, গ্রাফাইট, আর্সেনোলাইট, রেশম ও রেশমজাত দ্রব্য, পশম, চামড়া কাগজ, টুং তৈল, ধুনা, পোর্সিলেন, কাচের জিনিস, সূঁচ, বই, ফিল্ম ইত্যাদি।

ভারত ও তিব্বতের মধ্যে বাণিজ্য এবং চীন থেকে কলকাতার ভেতর দিয়ে তিব্বতে জিনিসপত্র পাঠাবার ব্যবস্থার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ভারত ও তিব্বতের মধ্যে বাণিজ্যের চিরাচরিত পদ্ধতি বজায় রাখা হয়েছে।

ভারত ও চীন উভয়ই কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু উভয়েই বর্তমানে শিল্পায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই জন্যই চুক্তিপত্রে দুই দেশের আমদানি-রপ্তানির তালিকায় যন্ত্রপাতির স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। এই চুক্তি অনুসারে ভারত থেকে চীনে তামাক রপ্তানি এবং সেখানে থেকে ভারতে চীনা রেশম আমদানির জন্য আলাপ-আলোচনা চলে।

আলোচ্য চুক্তির মেয়াদ দুই বৎসর এবং রুশ-ভারত বাণিজ্য-চুক্তির অনুকরণে এই চুক্তি রচিত হয়েছে। লেন-দেনের অঙ্কে এই চুক্তির ফলাফল আপাততঃ চমকপ্রদ না হলেও এর দ্বারা দুই দেশের মধ্যে আর্থিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে তুলবার সংকল্প বিজ্ঞাপিত হয়েছে। স্মরণাতীত কাল থেকে চীনের সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রথমে স্থলপথে চলত। তার পর বহুকাল

যাবৎ দুই দেশই বিদেশীদের বাঁধন-কষণে জর্জরিত ছিল। তার ফলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যবৃদ্ধির কিংবা অর্থনৈতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে তোলবার চেষ্টা এর আগে আর হয়নি। এইদিক থেকে চীন-ভারত বাণিজ্যচুক্তি নবভারত ও নয়া চীনের ইতিহাসে পারস্পারিক আন্তরিকতার এক নতুন অধ্যায় রচনা করবে এবং তার ফলাফল হবে সুদূরপ্রসারী।

পরিশিষ্ট—তিন

চীনা জন-গণতন্ত্রের সংবিধান

[এই সংবিধান চীনা জন-গণতন্ত্রের প্রথম জাতীয় গণকংগ্রেস কর্তৃক তাহার প্রথম অধিবেশনে ১৯৫৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর গৃহীত হয় এবং ১৯৫৪ সালের ১লা অক্টোবর হইতে বলবৎ হয়।]

ভূমিকা

এক শতাব্দীর অধিককালব্যাপী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পর ১৯৪৯ সালে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি-পরিচালিত চীনা জনগণ সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও আমলাতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণবিপ্লবে চূড়ান্তরূপে জয়লাভ করে এবং এইরূপে নিপীড়ন ও দাসত্বের দীর্ঘ ইতিহাসের অবসান ঘটাইয়া চীনা জন-গণতন্ত্র তথা জন-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে। নয়া গণতন্ত্র, জন-গণতন্ত্র তথা চীনা জন-গণতন্ত্রের পদ্ধতি নিশ্চয়তা দিতেছে যে, চীন শান্তিপূর্ণ উপায়ে শোষণ ও দারিদ্র্য নির্বাসিত করিতে এবং সমৃদ্ধ ও সুখী সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করিতে সমর্থ।

চীনা জন-গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইতে সমাজতান্ত্রিক সমাজে পৌছান পর্যন্ত রূপান্তর-সাধনের সময়। এই রূপান্তর-সাধনকালে রাষ্ট্রের মৌলিক কর্তব্য হইতেছে, ধাপে ধাপে দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন ঘটান এবং কৃষি, হস্তশিল্প ও ধনতান্ত্রিক শিল্পবাণিজ্যের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর-সাধনের কার্য শেষ করা। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের জনগণ সাফল্যের সহিত পর পর কতকগুলি সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছে, যথা—ভূমিব্যবস্থার সংস্কার, মার্কিন

আক্রমণ-প্রতিরোধ, কোরিয়াকে সাহায্য-দান, প্রতি-বিপ্লবীদিগকে দমন এবং জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা-প্রতিষ্ঠা। তাহার ফলে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক গঠনমূলক কার্য এবং ক্রমান্বয়ে সমাজতন্ত্রে রূপান্তর-ব্যবস্থার পক্ষে প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে।

গত ১৯৫৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর রাজধানী পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত চীনা জন-গণতন্ত্রের প্রথম জাতীয় গণকংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে চীনা জন-গণতন্ত্রের এই সংবিধান গাম্ভীর্যের সহিত গৃহীত হয়। এই সংবিধান ১৯৪৯ সালের রাজনৈতিক পরামর্শমূলক চীনা গণ-সম্মেলনের সাধারণ কার্যসূচীর উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তদবলম্বনে ইহার উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইহা চীনা গণবিপ্লবের সুফলসমূহ এবং চীনা জন-গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সকল জয়লাভ হইয়াছে, তৎসমুদয়ের সংহতি সাধন করিবে এবং অধিকন্তু রাষ্ট্রের রূপান্তর-সাধনকালীন প্রয়োজনসমূহ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনে সমগ্রভাবে জনসমাজের সাধারণ আকাঙ্ক্ষা ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

চীনা জন-গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার্থ বিপুল ও মহান্ সংগ্রামকালে আমাদের দেশের জনগণ চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি কর্তৃক পরিচালিত হইয়া সমস্ত গণতন্ত্রী শ্রেণী, সমস্ত গণতন্ত্রী দল ও উপদলের সমবায়ে ব্যাপক ভিত্তিতে এক গণতান্ত্রিক সম্মিলিত গণফ্রণ্ট দৃঢ়রূপে গঠন করিয়াছে। এই গণতান্ত্রিক সম্মিলিত গণফ্রণ্ট রূপান্তর-সাধনের পথে অগ্রগতির কালে রাষ্ট্রের মৌলিক কর্তব্য সম্পাদন এবং ভিতরে ও বাহিরে শত্রুগণকে প্রতিরোধের সাধারণ সংগ্রামে সমগ্র জনসমাজের সমাবেশ ও সংহতিসাধনে ইহার কর্তব্য পালন করিতে থাকিবে।

আমাদের দেশের সমস্ত জাতি স্বাধীন ও সমান জাতিসমূহের এক বিপুল পরিবারে সম্মিলিত হইয়াছে। চীনের জাতিসমূহের এই ঐক্য

ক্রমবর্ধমান সৌহার্দ্য, তাহাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এবং তাহা জাতিসমূহের মধ্যে জনসমাজের সর্বসাধারণের শত্রুগণের বিরোধী এবং প্রাধান্যবিশিষ্ট জাতির অন্ধ স্বদেশানুরাগ ও স্থানীয় জাতীয়তাবাদ—এই উভয়েরই বিরোধী বলিয়া তাহার শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নসাধন-কালে রাষ্ট্র বিভিন্ন জাতির প্রয়োজনসমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর-সাধনের ব্যাপারে প্রত্যেক জাতির উন্নয়ন-বিধানে তাহার বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি পূর্ণমনোযোগ দান করিবে।

চীন ইতঃপূর্বেই মহান্ সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক্স্ ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক গণরাষ্ট্রসমূহের (People's Democracies) সহিত অক্ষয় মৈত্রী স্থাপন করিয়াছে এবং আমাদের জনগণ ও অন্যান্য সমস্ত দেশের শান্তিপ্রিয় জনগণের মধ্যে সৌহার্দ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এইরূপ সৌহার্দ্য নিরবচ্ছিন্নভাবে দৃঢ় করা হইবে এবং তাহার প্রসারসাধন করা হইবে। সাম্য, পারস্পরিক কল্যাণ এবং পরস্পরের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধার আদর্শে অন্যান্য সমস্ত দেশের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক-স্থাপনে এবং এই সম্পর্কের বিস্তার-সাধনে চীনের যে নীতি ইতঃপূর্বেই ফলপ্রসূ হইয়াছে, তাহা অনুসৃত হইবে। বিশ্বশান্তির মহান্ কারণ ও মানবজাতির উন্নতির জন্য চেষ্টাই হইতেছে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আমাদের দৃঢ় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি।

প্রথম অধ্যায়

সাধারণ নীতিসমূহ

১ অনুচ্ছেদ : চীনা জন-গণতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক পরিচালিত এবং শ্রমিক ও কৃষকগণের সৌহার্দ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত জনসমাজের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

২ অনুচ্ছেদ : চীনা জন-গণতন্ত্রে জনগণ সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। যে সমস্ত সংস্থার মাধ্যমে জনগণ ক্ষমতা পরিচালনা করিবে, তৎসমুদয় হইতেছে জাতীয় গণকংগ্রেস ও স্থানীয় গণকংগ্রেসসমূহ।

জাতীয় গণকংগ্রেস, স্থানীয় গণকংগ্রেসসমূহ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য সংস্থা নির্বিশেষে গণতন্ত্রসম্মত কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিবে।

৩ অনুচ্ছেদ : চীনা জন-গণতন্ত্র একটি ঐক্যবদ্ধ, বহুজাতিসমন্বিত রাষ্ট্র।

সকল জাতি সমান। যে কোন জাতির প্রতি বিভেদমূলক আচরণ অথবা অত্যাচার এবং জাতিসমূহের ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর কার্যাবলী নিষিদ্ধ।

সকল জাতিরই তাহাদের কথ্য ও লিখিত ভাষার উন্নয়ন সাধন এবং তাহাদের প্রথা ও পদ্ধতি সংরক্ষণ বা সংস্কার করিবার স্বাধীনতা থাকিবে।

জাতিগত সংখ্যালঘুদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বা বহুলভাবে অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতা প্রযোজ্য। জাতীয় স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতাসম্পন্ন অঞ্চলসমূহ চীনা জন-গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৪ অনুচ্ছেদ ঃ চীনা জন-গণতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ ও সামাজিক শক্তিসমূহের উপর নির্ভর করিয়া এবং সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন ও সমাজতান্ত্রিক রূপায়ণ-ব্যবস্থার সাহায্যে ক্রমান্বয়ে শোষণমূলক পদ্ধতি-সমূহের উচ্ছেদ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-গঠনের নিশ্চয়তা দান করিতেছে।

৫ অনুচ্ছেদ ঃ চীনা জন-গণতন্ত্রে উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা বর্তমানে প্রধানতঃ নিম্নপ্রকার রূপগুলি গ্রহণ করিতেছে ঃ রাষ্ট্রের মালিকানা, অর্থাৎ সমগ্র জনসমাজের মালিকানা; সমবায়মূলক মালিকানা অর্থাৎ শ্রমিক-সাধারণের যৌথ মালিকানা ; ব্যক্তিগত শ্রমিকের মালিকানা এবং পুঁজিপতিদের মালিকানা।

৬ অনুচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্রীয় মালিকানা-বিশিষ্ট অর্থনীতি হইতেছে সমগ্র জনসমাজের মালিকানা-বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং ইহাই জাতীয় অর্থনীতিতে প্রধান শক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিস্বরূপ— যে ভিত্তিতে রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর-সাধনের কার্য পরিচালনা করিবে। রাষ্ট্রীয় মালিকানা-বিশিষ্ট অর্থনীতির উন্নয়নসাধন-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্র অগ্রাধিকার দান করিতেছে।

আইনতঃ রাষ্ট্রের মালিকানা-অধীন সকল খনিজসম্পদ, জল ও অনুন্নত ভূমি এবং অন্যান্য সম্পদ সমগ্র জনসমাজের সম্পত্তি।

৭ অনুচ্ছেদ ঃ সমবায়মূলক অর্থনীতি হইতেছে শ্রমিক-সাধারণের যৌথ মালিকানা-বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, অথবা শ্রমিক-সাধারণের আংশিক মালিকানা-বিশিষ্ট অর্ধ-সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি। শ্রমিক-সাধারণের এইরূপ আংশিক যৌথ মালিকানা হইতেছে রূপান্তরসাধন-কালীন একটি ব্যবস্থা—যাহার সাহায্যে ব্যক্তিগত কৃষকগণ, ব্যক্তিগত হস্তশিল্পিগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিগত

শ্রমিক শ্রমিক-সাধারণের যৌথ মালিকানার লক্ষ্যাভিমুখে তাহাদের অগ্রগতিতে নিজদিগকে সংগঠিত করিবে।

রাষ্ট্র সমবায়মূলক সংস্থাসমূহের সম্পত্তি রক্ষা করিবে এবং সমবায়মূলক অর্থনীতির উন্নয়নসাধনে উৎসাহ দিবে, তাহা পরিচালনা করিবে ও তাহাতে সাহায্য করিবে। ইহা উৎপাদনকারীদের সমবায়-মূলক সংস্থাসমূহের উন্নয়নসাধন-ব্যবস্থাকে ব্যক্তিগত কৃষিক্ষেত্রসকল ও ব্যক্তিগত হস্তশিল্পসমূহের রূপান্তর-সাধনের প্রধান উপায়-রূপে গণ্য করিবে।

৮ অনুচ্ছেদ : রাষ্ট্র কৃষকগণের ভূমির মালিকানা এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপায়কে আইনতঃ রক্ষা করিবে।

রাষ্ট্র ব্যক্তিগত কৃষকগণকে উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে এবং তাহাদিগকে উৎপাদনকারীদের সরবরাহ ও বিক্রয়-ব্যবস্থা এবং সমবায়মূলক ঋণদান-সংস্থাসমূহ স্বেচ্ছাপূর্বক সংগঠনে উৎসাহিত করিবে।

ধনী কৃষকগণের অর্থনীতি সম্পর্কে রাষ্ট্রের নীতি হইতেছে তাহার নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রমান্বয়ে তাহার বিলোপসাধন।

৯ অনুচ্ছেদ : রাষ্ট্র হস্তশিল্পিগণের ও অন্যান্য অ-কৃষিজীবী ব্যক্তিগত শ্রমিকের উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা আইনতঃ রক্ষা করিবে।

রাষ্ট্র ব্যক্তিগত হস্তশিল্পিগণকে ও অন্যান্য অ-কৃষিজীবী ব্যক্তিগত শ্রমিককে তাহাদের কার্যের পরিচালনা-ব্যবস্থার উন্নয়নসসাধনে পরিচালনা ও সহায়তা করিবে এবং তাহাদিগকে উৎপাদনকারীদের সমবায়মূলক সরবরাহ ও বিক্রয়-সংস্থাসমূহ স্বেচ্ছাপূর্বক সংগঠনে উৎসাহিত করিবে।

১০ অনুচ্ছেদ : রাষ্ট্র পুঁজিপতিদের উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা ও অন্য (প্রকারের) মূলধন আইনতঃ রক্ষা করিবে।

পুঁজিপতিদের শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে রাষ্ট্রের নীতি হইতেছে তাহার ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ ও রূপান্তরসাধন করা। পুঁজিপতিদের শিল্প ও বাণিজ্যের যে সমস্ত হিতকর গুণ জাতীয় কল্যাণ ও জনগণের জীবিকার পক্ষে সহায়ক, রাষ্ট্র তৎসমুদয়ের সদ্ব্যবহার করিবে, যে সমস্ত নেতিমূলক গুণ জাতীয় কল্যাণ ও জনগণের জীবিকার পক্ষে সহায়ক নহে, তৎসমুদয়ের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিবে, পুঁজিপতিদের মালিকানার স্থলে সমগ্র জনসমাজের মালিকানা ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া রাষ্ট্রীয়-ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাহাদের রূপান্তর-সাধনে উৎসাহিত ও পরিচালিত করিবে এবং রাষ্ট্রের প্রাশাসনিক সংস্থাসমূহের দ্বারা আরোপিত বিধিনিষেধসমূহের সাহায্যে এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানার অর্থনীতিতে ও কর্মীদের তত্ত্বাবধানে প্রাধান্য দিয়া রাষ্ট্র ইহা করিবে।

পুঁজিপতিদের যে কোনরূপ বে-আইনী কার্যকলাপ, যাহা জনস্বার্থকে বিপন্ন করে, সমাজবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, অথবা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষতি-সাধন করে, রাষ্ট্র তাহা নিষিদ্ধ করিতেছে।

১১ অনুচ্ছেদ ঃ নাগরিকগণের আইনানুমোদিত আয়, সঞ্চয়, গৃহ ও জীবনোপায়সমূহের মালিকানার অধিকার রাষ্ট্র রক্ষা করিবে।

১২ অনুচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বে নাগরিকগণের অধিকার আইনতঃ রক্ষা করিবে।

১৩ অনুচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্র জনস্বার্থের খাতিরে শহরে ও পল্লীঅঞ্চলে উভয় ক্ষেত্রেই ভূমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপায় আইনতঃ ক্রয়, তলব-দখল ও রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে পারিবে।

১৪ অনুচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্র যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর কার্যে তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতেছে।

১৫ অনুচ্ছেদ ঃ উৎপাদনমূলক শক্তিসমূহের নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধি-সাধনের জন্য রাষ্ট্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দ্বারা জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ও রূপান্তরসাধন-কার্য পরিচালনা করিবে এবং এইভাবে জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক জীবন সমৃদ্ধ করিবে এবং দেশের স্বাধীনতা ও নিরপত্তা সংহত করিবে।

১৬ অনুচ্ছেদ ঃ চীনা জন-গণতন্ত্রের কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের নিকট কর্ম সম্মানজনক বিষয়। রাষ্ট্র নাগরিকগণকে তাহাদের কার্যের উদ্যোগ ও সৃজনমূলক প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিবে।

১৭ অনুচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্রের সমস্ত সংস্থা জনসাধারণের উপর অবশ্যই নির্ভর করিবে, তাহাদের সহিত সর্বদা ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করিবে, তাহাদের অভিমত শ্রবণ করিবে এবং তাহাদিগকে তত্ত্বাবধান করিতে দিবে।

১৮ অনুচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্রের সংস্থাসমূহে কর্মরত সমস্ত ব্যক্তি অবশ্যই জন-গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি অনুগত থাকিবে, সংবিধান ও আইন মানিয়া চলিবে এবং জনগণের সেবার জন্য সচেষ্ট থাকিবে।

১৯ অনুচ্ছেদ ঃ চীনা জন-গণতন্ত্র জন-গণতান্ত্রিক পদ্ধতির রক্ষাব্যবস্থা করিবে। সমস্ত রাষ্ট্রদ্রোহ ও প্রতি-বিপ্লবমূলক কার্যকলাপ দমন করিবে এবং সমস্ত রাষ্ট্রদ্রোহী ও প্রতি-বিপ্লবীকে শাস্তিদান করিবে।

রাষ্ট্র সামন্ততান্ত্রিক ভূম্যধিকারী ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতিগণকে একটা নির্দিষ্ট কালের জন্য রাজনৈতিক অধিকারসমূহ হইতে আইন অনুসারে বঞ্চিত করিবে এবং সেই সঙ্গে তাহারা যাহাতে নিজেদের সংস্কারসাধন করিতে সমর্থ হয় এবং স্ব স্ব শ্রমের সাহায্যে জীবিকার্জনক্ষম নাগরিক হইতে পারে, তাহাদের তদুপযোগী জীবনযাপন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিবে।

২০ অনুচ্ছেদঃ জনগণ চীনা জন-গণতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীর মালিক। গণবিপ্লবলব্ধ সুফলসমূহ ও জাতি-গঠনমূলক কার্যের রক্ষাব্যবস্থা এবং দেশের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা করা তাহাদের কর্তব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রের গঠনগত রূপ

প্রথম খণ্ডঃ জাতীয় গণকংগ্রেস

২১ অনুচ্ছেদঃ চীনা জন-গণতন্ত্রের জাতীয় গণকংগ্রেস রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা।

২২ অনুচ্ছেদঃ জাতীয় গণকংগ্রেসই একমাত্র সংস্থা, যাহা রাষ্ট্রের আইনগত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

২৩ অনুচ্ছেদঃ প্রদেশসমূহ, স্বায়ত্তশাসনাধিকার-সম্পন্ন অঞ্চল-সমূহ, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষভা ব অধানস্থ মিউনিসিপ্যালিটি-সকল, সশস্ত্র বাহিনী ও বিদেশবাসী চীনাগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে (ডেপুটীগণকে) লইয়া জাতীয় গণকংগ্রেস গঠিত হইবে।

জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিগণ সহ জাতীয় গণকংগ্রেসের প্রতিনিধিগণের সংখ্যা ও নির্বাচন-পদ্ধতি নির্বাচন আইন দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৪ অনুচ্ছেদঃ জাতীয় গণকংগ্রেস চারি বৎসর কালের জন্য নির্বাচিত হইবে।

জাতীয় গণকংগ্রেসের কার্যকাল শেষ হইবার দুইমাস পুর্বে স্ট্যাণ্ডিং কমিটী পরবর্তী জাতীয় গণকংগ্রেসের প্রতিনিধিগণের নির্বাচনকার্য শেষ করিবে। যদি কোন বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হয়,

এবং তাহার ফলে এইরূপ নির্বাচনকার্যে বাধাসৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ক্ষমতাধিষ্ঠিত জাতীয় গণকংগ্রেসের কার্যকাল পরবর্তী জাতীয় গণকংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইতে পারিবে।

২৫ অনুচ্ছেদঃ জাতীয় গণকংগ্রেসের, ইহার স্ট্যাণ্ডিং কমিটীর আহ্বানক্রমে, বৎসরে একবার অধিবেশন হইবে। স্ট্যাণ্ডিং কমিটী যখনই প্রয়োজন মনে করিবে, অথবা প্রতিনিধিগণের এক-পঞ্চমাংশ অধিবেশনের প্রস্তাব করিলেও অধিবেশন আহ্বান করা যাইতে পারিবে।

২৬ অনুচ্ছেদঃ জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন যখন অনুষ্ঠিত হইবে, তখন ইহা ইহার অধিবেশন-পরিচালনার জন্য সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচন করিবে।

২৭ অনুচ্ছেদঃ জাতীয় গণকংগ্রেস নিম্নলিখিত কার্যাবলী ও ক্ষমতাসমূহ পরিচালনা করিবেঃ

(১) সংবিধান-সংশোধন ;

(২) আইনসমূহ বিধিবদ্ধ করণ ;

(৩) সংবিধান বলবৎ করিবার ব্যাপার তত্ত্বাবধান ;

(৪) চীনা জন-গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি (চেয়ারম্যান) ও উপ-রাষ্ট্রপতি (ভাইস-চেয়ারম্যান) নির্বাচন ;

(৫) চীনা জন-গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির সুপারিশ-ক্রমে রাষ্ট্র-পরিষদের প্রধানমন্ত্রীকে এবং প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে, যে সমস্ত সদস্যকে লইয়া রাষ্ট্র পরিষদ গঠিত হইবে, তাঁহাদিগকে মনোনয়ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ ;

(৬) চীনা জন-গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির সুপারিশক্রমে জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের সহকারী সভাপতিগণকে ও সদস্যগণকে মনোনয়ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ ;

(৭) সর্বোচ্চ গণ-আদালতের বিচারাধিপতি (প্রেসিডেন্ট) নির্বাচন ;

(৮) সর্বোচ্চ গণ-আইন-তত্ত্বাবধায়ক সংস্থার প্রধান আইন-তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন ;

(৯) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ;

(১০) রাষ্ট্রের বাজেট ও আর্থিক বিবরণ পরীক্ষা ও অনুমোদন ;

(১১) প্রদেশসমূহ, স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতা-সম্পন্ন অঞ্চলসকল ও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষভাবে অধীনস্থ মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের মর্যাদা ও সীমানা অনুমোদন ;

(১২) সাধারণভাবে অপরাধ-মার্জনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ;

(১৩) যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ; এবং

(১৪) জাতীয় গণকংগ্রেস যেরূপ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিবে, তদনুসারে অন্যান্য কার্য ও ক্ষমতা পরিচালনা।

২৮ অনুচ্ছেদ : জাতীয় গণকংগ্রেসের পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা আছে :

(১) চীনা জন-গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতিকে ;

(২) প্রধানমন্ত্রী, সহকারী প্রধানমন্ত্রিগণ, মন্ত্রিগণ, কমিশন-সমূহের প্রধানগণ ও রাষ্ট্র পরিষদের সেক্রেটারি-জেনারেলকে ;

(৩) জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের সহকারী সভাপতিগণকে ও সদস্যগণকে ;

(৪) সর্বোচ্চ গণ-আদালতের বিচারাধিপতিকে ;

(৫) সর্বোচ্চ গণ-আইন-তত্ত্বাবধায়ক সংস্থার প্রধান আইন-তত্ত্বাবধায়ককে।

২৯ অনুচ্ছেদ : সংবিধান-সংশোধনে জাতীয় গণকংগ্রেসের সমস্ত প্রতিনিধির দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্য আবশ্যক হইবে।

আইনসমূহ ও অন্যান্য বিলের পক্ষে জাতীয় গণকংগ্রেসের সমস্ত প্রতিনিধির অধিকাংশের ভোটাধিক্য আবশ্যক হইবে।

৩০ অনুচ্ছেদ : জাতীয় গণকংগ্রেসের স্ট্যাণ্ডিং কমিটী জাতীয় গণকংগ্রেসের একটি স্থায়ী সংস্থা।

জাতীয় গণকংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচিত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া জাতীয় গণকংগ্রেসের স্ট্যাণ্ডিং কমিটী গঠিত হইবে :

সভাপতি ;
সহকারী সভাপতিগণ ;
সেক্রেটারি-জেনারেল ;
সদস্যগণ।

৩১ অনুচ্ছেদ : জাতীয় গণকংগ্রেসের স্ট্যাণ্ডিং কমিটী নিম্নলিখিত কার্যাবলী ও ক্ষমতাসমূহ পরিচালনা করিবে :

(১) জাতীয় গণকংগ্রেসের প্রতিনিধিগণের নির্বাচন পরিচালনা ;

(২) জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান ;

(৩) আইনসমূহের ব্যাখ্যাদান ;

(৪) বিশেষ বিধানসমূহ গ্রহণ ;

(৫) রাষ্ট্র পরিষদ, সর্বোচ্চ গণ-আদালত ও সর্বোচ্চ গণ-আইন-তত্ত্বাবধায়ক সংস্থার কার্য-তত্ত্বাবধান ;

(৬) রাষ্ট্র পরিষদের সিদ্ধান্ত ও আদেশসমূহ যে সব ক্ষেত্রে সংবিধান, আইনসমূহ বা বিশেষ বিধানসমূহের বিরোধী হইবে, সেই সব ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত ও আদেশ বাতিল করা ;

(৭) প্রদেশসকল, স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন অঞ্চলসমূহ ও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষভাবে অধীনস্থ মিউনিসিপ্যালটিসমূহের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-পরিচালক সংস্থাগুলির অসঙ্গত সিদ্ধান্তসমূহ সংশোধন বা বাতিল করা।

(৮) জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন যে সময় চলিবে না, সেই সময় যে কোন সহকারী প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, কমিশনের প্রধান বা রাষ্ট্র পরিষদের সেক্রেটারি-জেনারেলের নিয়োগ বা অপসারণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ;

(৯) সর্বোচ্চ গণ-আদালতের বিচার কমিটীর সহকারী বিচারাধিপতিগণ, বিচারকগণ ও সদস্যগণকে নিয়োগ বা অপসারণ ;

(১০) সর্বোচ্চ গণ-আইন-তত্ত্বাবধায়ক সংস্থার আইন-তত্ত্বাবধান কমিটীর সহকারী প্রধান আইন-তত্ত্বাবধায়কগণ, আইন-তত্ত্বাবধায়কগণ ও সদস্যগণকে নিয়োগ অথবা অপসারণ ;

(১১) বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কূটনৈতিক দূতগণকে নিয়োগ বা তাঁহাদিগকে দেশে ফিরাইয়া আনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ;

(১২) বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সহিত সম্পাদিত চুক্তিসমূহ অনুমোদন বা বাতিল করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ;

(১৩) সামরিক, কূটনৈতিক ও অন্যান্য ধরণের উপাধি ও মর্যাদা-দানের ব্যবস্থা প্রবর্তন ;

(১৪) রাষ্ট্রীয় সম্মান, পদক ও সম্মানসূচক উপাধিসমূহ প্রবর্তন এবং তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ;

(১৫) ক্ষমা মঞ্জুর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ;

(১৬) জাতীয় গণ-কংগ্রেসের অধিবেশন যে সময় চলিবে না, সেই সময় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ ঘটিলে অথবা আক্রমণের বিরুদ্ধে সাধারণ প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধ্যবাধকতা পালনার্থ যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ;

(১৭) সাধারণ বা আংশিকভাবে (সামরিক) সমাবেশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ;

(১৮) সমগ্র দেশে অথবা কোন কোন এলাকায় সামরিক আইন বলবৎ করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ; এবং

(১৯) জাতীয় গণকংগ্রেস কর্তৃক ইহার (স্ট্যাণ্ডিং কমিটীর) উপর অন্যান্য যে সমস্ত কার্য ও ক্ষমতা ন্যস্ত হইবে, তৎসমুদয় পরিচালনা।

৩২ অনুচ্ছেদ : পরবর্তী জাতীয় গণ-কংগ্রেস কর্তৃক নূতন স্ট্যাণ্ডিং কমিটী নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় গণকংগ্রেসের স্ট্যাণ্ডিং কমিটী তাহার কার্য ও ক্ষমতাসমূহ পরিচালনা করিবে।

৩৩ অনুচ্ছেদ : জাতীয় গণকংগ্রেসের স্ট্যাণ্ডিং কমিটী জাতীয় গণকংগ্রেসের নিকট দায়ী থাকিবে এবং তাহার নিকট কার্যবিবরণ পেশ করিবে।

জাতীয় গণকংগ্রেসের তাহার স্ট্যাণ্ডিং কমিটীর সদস্যগণকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

৩৪ অনুচ্ছেদ : জাতীয় গণকংগ্রেস একটি জাতি কমিটী, একটি বিল কমিটী, একটি বাজেট কমিটী, একটি পরিচয়পত্র কমিটী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কমিটী গঠন করিবে।

জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন যখন চলিবে না, তখন জাতি কমিটী ও বিল কমিটী জাতীয় গণকংগ্রেসের স্ট্যাণ্ডিং কমিটীর পরিচালনাধীন হইবে।

৩৫ অনুচ্ছেদ : জাতীয় গণকংগ্রেস, অথবা জাতীয় গণ-কংগ্রেসের অধিবেশন না চলিবার সময় স্ট্যাণ্ডিং কমিটী প্রয়োজন বোধ করিলে নির্দিষ্ট প্রশ্নসমূহ সম্পর্কে তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটী-সমূহ গঠিত হইতে পারিবে।

এই সমস্ত কমিটী যখন তদন্তকার্য পরিচালনা করিবে, তখন সকল রাষ্ট্রীয় সংস্থা, সমুদয় গণসংস্থা ও সংশ্লিষ্ট সমস্ত নাগরিক

এই সমস্ত কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

৩৬ অনুচ্ছেদ: জাতীয় গণকংগ্রেসের প্রতিনিধিগণের রাষ্ট্র-পরিষদকে, মন্ত্রিগণকে ও রাষ্ট্র পরিষদদের কমিশনসমূহকে প্রশ্ন করিবার অধিকার থাকিবে এবং রাষ্ট্র পরিষদ, মন্ত্রিগণ ও রাষ্ট্র পরিষদের কমিশনসমূহ উত্তর দিতে বাধ্য থাকিবেন।

৩৭ অনুচ্ছেদ: জাতীয় গণকংগ্রেসের অথবা জাতীয় গণ-কংগ্রেসের অধিবেশন না চলিবার সময় স্ট্যাণ্ডিং কমিটির অনুমতি ব্যতীত জাতীয় গণকংগ্রেসের কোন প্রতিনিধিকেই গ্রেপ্তার অথবা বিচারার্থ হাজির করা যাইবে না।

৩৮ অনুচ্ছেদ: জাতীয় গণকংগ্রেসের প্রতিনিধিগণকে যে সমস্ত নির্বাচক সংস্থা নির্বাচন করিবে, তাঁহারা তাহাদের তত্ত্বাবধানাধীন হইবেন। এই সমস্ত নির্বাচক সংস্থা যে প্রতিনিধিগণকে নির্বাচন করিবে, তাঁহাদিগকে যে কোন সময়ে আইনানুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা তাহাদের (নির্বাচক সংস্থা-সমূহের) থাকিবে।

দ্বিতীয় খণ্ড: চীনা জন-গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি

৩৯ অনুচ্ছেদ: চীনা জন-গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি জাতীয় গণ-কংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। চীনা জন-গণতন্ত্রের যে কোন নাগরিক, যাঁহার ভোটদানের ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার অধিকার আছে এবং যিনি ৩৫ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি চীনা জন-গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচনের যোগ্যতাসম্পন্ন হইবেন।

চীনা জন-গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির কার্যকাল চারি বৎসর হইবে।

৪০ অনুচ্ছেদ ঃ চীনা জন-গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি জাতীয় গণকংগ্রেস অথবা স্ট্যাণ্ডিং কমিটীর সিদ্ধান্ত অনুসারে আইনসমূহ ও বিশেষ বিধানসমূহ জারী করিবেন; প্রধানমন্ত্রী, সহকারী প্রধানমন্ত্রিগণ, মন্ত্রিগণ, কমিশনসমূহের প্রধানগণ ও রাষ্ট্র পরিষদদের সেক্রেটারি-জেনারেলকে নিয়োগ অথবা অপসারণ করিবেন; জাতীয় প্রতিরক্ষা-পরিষদের সহকারী সভাপতিগণকে ও সদস্যগণকে নিয়োগ অথবা অপসারণ করিবেন; রাষ্ট্রীয় সম্মান, পদকসমূহ ও সম্মানজনক উপাধি-সমূহ দান করিবেন; সাধারণভাবে অপরাধ মার্জনার বিষয় ঘোষণা করিবেন এবং ক্ষমা মঞ্জুর করিবেন; সামরিক আইন জারী করিবেন; যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করিবেন; এবং (সামরিক) সমাবেশের আদেশ দিবেন।

৪১ অনুচ্ছেদ ঃ চীনা জন-গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি বৈদেশিক রাষ্ট্র-সমূহের সহিত সম্পর্কের ব্যাপারে চীনা জন-গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করিবেন, বৈদেশিক দূতগণকে গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় গণ-কংগ্রেসের স্ট্যাণ্ডিং কমিটীর সিদ্ধান্ত অনুসারে বৈদেশিক রাষ্ট্র-সমূহে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দূতগণকে নিয়োগ করিবেন বা ফিরাইয়া আনিবেন এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সহিত সম্পাদিত সন্ধিচুক্তিসমূহ অনুমোদন করিবেন।

৪২ অনুচ্ছেদ ঃ চীনা জন-গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে পরিচালনা করিবেন এবং তিনি জাতীয় প্রতিরক্ষা-পরিষদের সভাপতি হইবেন।

৪৩ অনুচ্ছেদ ঃ চীনা জন-গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, যখনই প্রয়োজন হইবে, সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মেলন আহ্বান করিবেন এবং তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিবেন।

চীনা জন-গণতন্ত্রের উপরাষ্ট্রপতি, জাতীয় গণকংগ্রেসের স্ট্যাণ্ডিং

কমিটীর সভাপতি, রাষ্ট্র পরিষদের প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে যোগদান করিবেন।

চীনা জন-গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সম্পর্কে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অভিমতসমূহ জাতীয় গণকংগ্রেস, ইহার স্ট্যাণ্ডিং কমিটী, রাষ্ট্র পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার নিকট তাহাদের বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করিবেন।

৪৪ অনুচ্ছেদ : চীনা জন-গণতন্ত্রের উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার কার্যে সাহায্য করিবেন। রাষ্ট্রপতি যে সমস্ত কার্যভার ও ক্ষমতার অংশ তাঁহার উপর ন্যস্ত করিবেন, উপরাষ্ট্রপতি তাহা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চীনা জন-গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও কার্যকাল-নিয়ামক যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে, চীনা জন-গণতন্ত্রের উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও কার্যকাল সম্পর্কেও তৎসমুদয় প্রযোজ্য হইবে।

৪৫ অনুচ্ছেদ : পরবর্তী জাতীয় গণকংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচিত নূতন রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত চীনা জন-গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি তাঁহাদের কার্যাবলী ও ক্ষমতাসমূহ পরিচালনা করিবেন।

৪৬ অনুচ্ছেদ : চীনা জন-গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি স্বাস্থ্যের কারণে দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহার কর্তব্য-সম্পাদনে অসমর্থ হইলে, রাষ্ট্রপতির কার্যাবলী ও ক্ষমতাসমূহ তাঁহার পক্ষে উপরাষ্ট্রপতি পরিচালনা করিবেন।

চীন জন-গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির স্থলাভিষিক্ত হইবেন।

তৃতীয় খণ্ড : রাষ্ট্র পরিষদ

৪৭ অনুচ্ছেদ : চীনা জন-গণতন্ত্রের রাষ্ট্র পরিষদ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় গণসরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহক সংস্থা ; ইহা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসন-পরিচালক সংস্থা।

৪৮ অনুচ্ছেদ : রাষ্ট্র পরিষদ নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগণকে লইয়া গঠিত হইবে :

প্রধানমন্ত্রী ;
সহকারী প্রধানমন্ত্রিগণ ;
মন্ত্রিগণ ;
কমিশনসমূহের প্রধানগণ ;
সেক্রেটারি-জেনারেল।

রাষ্ট্র পরিষদের সংগঠন আইন অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

৪৯ অনুচ্ছেদ : রাষ্ট্র পরিষদ নিম্নলিখিত কার্যাবলী ও ক্ষমতা-সমূহ পরিচালনা করিবে :

(১) শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যবস্থাসমূহ প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত-সমূহ ও আদেশসমূহ জারী করণ এবং সংবিধান, আইনসমূহ ও বিশেষ বিধানসমূহ অনুসারে তৎসমুদয় কার্যে রূপায়িত হইতেছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করা।

(২) জাতীয় গণকংগ্রেস অথবা ইহার স্ট্যাণ্ডিং কমিটীর নিকট বিলসমূহ পেশ করা ;

(৩) মন্ত্রিগণ ও কমিশনসমূহের কার্যের সমন্বয়-সাধন ও তাহা পরিচালনা করা ;

(৪) সমগ্র দেশে রাষ্ট্রের স্থানীয় শাসন-পরিচালক সংস্থাসমূহের কার্যের সমন্বয়সাধন ও তাহা পরিচালনা করা ;

(৫) মন্ত্রিগণ বা কমিশনসমূহের প্রধানগণের অসঙ্গত আদেশসমূহ ও নির্দেশাবলী সংশোধন অথবা বাতিল করা ;

(৬) রাষ্ট্রের স্থানীয় শাসন-পরিচালক সংস্থাসমূহের অসঙ্গত সিদ্ধান্তসমূহ ও আদেশসকল সংশোধন অথবা বাতিল করা ;

(৭) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রের বাজেটের ব্যবস্থা-সমূহ কার্যকর করা ;

(৮) বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা ;

(৯) সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যের নির্দেশ দান করা ;

(১০) জাতিসমূহ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পরিচালনা করা ;

(১১) বিদেশবাসী চীনাগণ সম্পর্কিত ব্যাপারসমূহ পরিচালনা করা ;

(১২) রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষা, জনসাধারণের মধ্যে শৃঙ্খলারক্ষা এবং নাগরিকগণের অধিকার রক্ষা করা ;

(১৩) পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপারসমূহ পরিচালনায় নির্দেশ দান করা ;

(১৪) প্রতিরক্ষা-বাহিনীর গঠনকার্য পরিচালনা করা ;

(১৫) স্বায়ত্তশাসনাধিকারসম্পন্ন 'চৌ', 'কউন্টি'সমূহ, স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারসম্পন্ন 'কাউন্টি'সমূহ ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলির মর্যাদা ও চতুঃসীমানা অনুমোদন করা ;

(১৬) আইনের ব্যবস্থাসমূহ অনুসারে শাসনপরিচালনাকারী ব্যক্তিগণকে নিয়োগ অথবা অপসারণ করা ; এবং

(১৭) জাতীয় গণকংগ্রেস অথবা ইহার স্ট্যাণ্ডিং কমিটী কর্তৃক অন্যান্য যে সমস্ত কার্য ও ক্ষমতা ইহার (রাষ্ট্র পরিষদের) উপর ন্যস্ত হইবে, তৎসমুদয় পরিচালনা করা।

৫০ অনুচ্ছেদ : প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্র পরিষদের কার্যে নির্দেশ দান করিবেন এবং ইহার অধিবেশনসমূহে সভাপতিত্ব করিবেন।

সহকারী প্রধানমন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রীকে তাঁহার কার্যে সহায়তা করিবেন।

৫১ অনুচ্ছেদ : মন্ত্রিগণ ও কমিশনসমূহের প্রধানগণ তাঁহাদের স্ব স্ব বিভাগের কার্যে নির্দেশদান করিবেন। মন্ত্রিগণ ও কমিশন-সমূহের প্রধানগণ তাঁহাদের স্ব স্ব বিভাগের এক্তিয়ারের মধ্যে এবং আইনসমূহ, বিশেষ বিধানসমূহ এবং রাষ্ট্রপরিষদের সিদ্ধান্তসকল ও আদেশসমূহ অনুসারে আদেশসকল ও নির্দেশসমূহ জারী করিতে পারিবেন।

৫২ অনুচ্ছেদ : রাষ্ট্র পরিষদ জাতীয় গণকংগ্রেসের নিকট দায়ী থাকিবে এবং ইহার নিকট অথবা জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন না চলিতে থাকার সময় ইহার স্ট্যাণ্ডিং কমিটীর নিকট কার্যবিবরণ পেশ করিবে।

চতুর্থ খণ্ড : স্থানীয় গণকংগ্রেসসমূহ ও স্থানীয় জন-পরিষদসমূহ

৫৩ অনুচ্ছেদ : চীনা জন-গণতন্ত্রের শাসনপরিচালনা সংক্রান্ত বিভাগসমূহ নিম্নরূপ হইবে :

(১) প্রদেসশমূহ, স্বায়ত্তশাসনাধিকারসম্পন্ন অঞ্চলসমূহ ও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষভাবে অধীনস্থ মিউনিসিপ্যালিটিসমূহে দেশ বিভক্ত হইবে ;

(২) প্রদেশসমূহ ও স্বায়ত্তশাসনাধিকারসম্পন্ন অঞ্চলসমূহ স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারসম্পন্ন 'চৌ', 'কাউন্টি'সমূহ, স্বায়ত্তশাসনাধিকারসম্পন্ন 'কাউন্টি'সকল ও মিউনিসিপ্যালিটিসমূহে বিভক্ত হইবে ;

(৩) 'সিয়াং', জাতিগত 'সিয়াং' ও শহরসমূহে 'কাউন্টি'সমূহ ও স্বায়ত্তশাসনাধিকারসম্পন্ন 'কাউন্টি'সমূহ বিভক্ত হইবে ;

কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষভাবে অধীনস্থ মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ ও অন্যান্য বৃহৎ মিউনিসিপ্যালিটি জেলাসমূহে বিভক্ত হইবে। 'কাউন্টি'সমূহ, স্বায়ত্তশাসনাধিকারসম্পন্ন 'কাউন্টিসমূহ' ও মিউনিসিপ্যালিটিসমূহে স্বায়ত্তশাসনাধিকারসম্পন্ন 'চৌ'সমূহ বিভক্ত হইবে।

স্বায়ত্তশাসনাধিকারসম্পন্ন অঞ্চলসমূহ, স্বায়ত্তশাসনাধিকারসম্পন্ন 'চৌ'সকল ও স্বায়ত্তশাসনাধিকারসম্পন্ন 'কাউন্টি'গুলির সমস্তই জাতীয় স্বায়ত্তশাসনাধিকারসম্পন্ন এলাকা।

৫৪ অনুচ্ছেদ : প্রদেশসমূহ, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষভাবে অধীনস্থ মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ, মিউনিসিপ্যাল জেলাগুলি, 'সিয়াং', জাতিগত 'সিয়াং' ও শহরসমূহে গণকংগ্রেসসমূহ ও জনপরিষদসকল স্থাপিত হইবে। স্বায়ত্তশাসনাধিকারসম্পন্ন অঞ্চলসমূহ, স্বায়ত্তশাসনাধিকারসম্পন্ন 'চৌ' ও স্বায়ত্তশাসনাধিকাসম্পন্ন 'কাউন্টি'গুলিতে স্বায়ত্তশাসন-পরিচালক সংস্থাসকল স্থাপিত হইবে। স্বায়ত্তশাসন-পরিচালক সংস্থাসমূহের সংগঠন ও কার্য সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডে নির্দেশিত হইয়াছে।

৫৫ অনুচ্ছেদ : সর্বপর্যায়ের স্থানীয় গণকংগ্রেসসমূহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার স্থানীয় সংস্থাসমূহ হইবে।

৫৬ অনুচ্ছেদ : প্রদেশসমূহ, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষভাবে অধীনস্থ মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ, 'কাউন্টি'সকল ও জেলাসমূহে বিভক্ত মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের গণকংগ্রেসগুলির প্রতিনিধিগণ পরবর্তী অধস্তন পর্যায়ের গণকংগ্রেসসমূহ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন; জেলাসমূহে বিভক্ত নহে—এরূপ মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ, মিউনিসিপ্যাল জেলাসমূহ, 'সিয়াং', জাতিগত 'সিয়াং' ও শহরসমূহে

গণকংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ সরাসরি ভোটদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।

স্থানীয় গণকংগ্রেসসমূহের প্রতিনিধিগণের সংখ্যা এবং তাঁহাদের নির্বাচনপদ্ধতি নির্বাচন আইন দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫৭ অনুচ্ছেদ : প্রাদেশিক গণকংগ্রেসসমূহের কার্যকাল চারি বৎসর হইবে। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষভাবে অধীনস্থ মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ 'কাউন্টি'সমূহ, মিউনিসিপ্যালিটিসকল মিউনিসিপ্যাল জেলাসমূহ, 'সিয়াং', জাতিগত 'সিয়াং' ও শহর-সমূহের গণকংগ্রেসগুলির কার্যকাল দুই বৎসর হইবে।

৫৮ অনুচ্ছেদ : সর্বপর্যায়ের স্থানীয় গণকংগ্রেসসমূহ তাহাদের স্ব স্ব শাসন-এলাকাসমূহে আইন ও বিশেষবিধানসমূহ-পালনের এবং কার্যকর করিবার নিশ্চয়তা দিবে; স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং পূর্তকার্যের পরিকল্পনা রচনা করিবে; স্থানীয় বাজেটসকল ও অর্থনৈতিক বিবরণসমূহ পরীক্ষা ও অনুমোদন করিবে; সরকারী সম্পত্তিসমূহ রক্ষা করিবে; সর্বসাধারণের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে। নাগরিকগণের অধিকার ও জাতিগত সংখ্যালঘুগণের সমানাধিকারের রক্ষাব্যবস্থা করিবে।

৫৯ অনুচ্ছেদ : স্থানীয় গণকংগ্রেসসমূহ তাহাদের সমপর্যায়ভুক্ত সমস্ত জন-পরিষদের সদস্যগণকে নির্বাচন করিবে এবং সেই সদস্যগণকে অপসারণ করিবার ক্ষমতা তাহাদের থাকিবে।

'কাউন্টি'-পর্যায়ের ও তদূর্ধ্বতন গণকংগ্রেসসমূহ সমপর্যায়ভুক্ত গণ-আদালতসমূহের বিচারাধিপতিগণকে নির্বাচন করিবে এবং সেই বিচারাধিপতিগণকে অপসারণ করিবার ক্ষমতা তাহাদের থাকিবে।

৬০ অনুচ্ছেদ : স্থানীয় গণকংগ্রেসসমূহ আইনানুমোদিত কর্তৃত্বসীমার মধ্যে সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও জারী করিবে।

জাতিগত 'সিয়াং-এর গণকংগ্রেসসমূহ আইনানুমোদিত কর্তৃত্বসীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট জাতিগুলির বিশেষত্বসমূহের পক্ষে উপযুক্ত নির্দিষ্ট ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করিতে পারিবে।

স্থানীয় গণকংগ্রেসসমূহের তাহাদের সমপর্যায়ভুক্ত জন-পরিষদ-সমূহের অসঙ্গত "সিদ্ধান্তসমূহ ও আদেশসকল সংশোধন অথবা বাতিল করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

'কাউন্টি'-পর্যায়ের ও তদূর্ধ্বতন গণকংগ্রেসসমূহের পরবর্তী অধস্তন পর্যায়ের গণকংগ্রেসসমূহের অসঙ্গত সিদ্ধান্তসমূহ এবং পরবর্তী অধস্তনপর্যায়ের জন-পরিষদসমূহের অসঙ্গত সিদ্ধান্তসমূহ ও আদেশসকল সংশোধন অথবা বাতিল করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

৬১ অনুচ্ছেদ ঃ প্রদেশসমূহ, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষভাবে অধীনস্থ মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ, 'কাউন্টি'সকল ও জেলাসমূহে বিভক্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলির প্রতিনিধিগণ, যে সমস্ত নির্বাচক সংস্থা তাঁহাদিগকে নির্বাচন করিবে, তাহাদের তত্ত্বাবধানাধীন হইবেন। জেলাসমূহে বিভক্ত নহে—এরূপ মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ মিউনিসিপ্যাল জেলাসকল, 'সিয়াং', জাতিগত 'সিয়াং' ও শহর-সমূহের গণকংগ্রেসগুলির প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের নির্বাচকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানাধীন হইবেন। স্থানীয় গণকংগ্রেসসমূহের প্রতিনিধিগণকে যে সমস্ত নির্বাচক সংস্থা ও নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচন করিবে, আইনানুমোদিত পদ্ধতিতে যে কোন সময়ে তাহাদের প্রতিনিধিগণকে অপসারণ করিবার ক্ষমতা তাহাদের থাকিবে।

৬২ অনুচ্ছেদ ঃ স্থানীয় জন-পরিষদসমূহ, অর্থাৎ স্থানীয় গণসরকারসমূহ হইতেছে সমপর্যায়ভুক্ত স্থানীয় গণকংগ্রেসসমূহের কার্যনির্বাহক সংস্থা এবং রাষ্ট্রের স্থানীয় শাসনপরিচালক সংস্থা।

৬৩ অনুচ্ছেদ ঃ স্থানীয় জনপরিষদ তাহার পর্যায় অনুযায়ী যে ক্ষেত্রে যেরূপ তদনুসারে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সহকারী প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ, অথবা মেয়র ও সহকারী মেয়রগণ, অথবা 'কাউন্টি'-প্রধান ও সহকারী 'কাউন্টি'-প্রধানগণ, অথবা জেলার প্রধান ও জেলার সহকারী প্রধানগণ, অথবা 'সিয়াং'-প্রধান ও সহকারী 'সিয়াং'-প্রধানগণ, অথবা শহর-প্রধান ও সহকারী শহর-প্রধানগণ এবং তৎসহ পরিষদ-সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে।

স্থানীয় জন-পরিষদের কার্যকাল সমপর্যায়ভুক্ত স্থানীয় গণকংগ্রেসের অনুরূপ হইবে।

স্থানীয় জন-পরিষদসমূহের সংগঠন আইনানুসারে নির্ধারিত হইবে।

৬৪ অনুচ্ছেদ ঃ স্থানীয় জন-পরিষদসমূহ আইনানুমোদিত কর্তৃত্বসীমার মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব এলাকাগুলিতে শাসনকার্য পরিচালনা করিবে।

স্থানীয় জন-পরিষদসমূহ সমপর্যায়ভুক্ত গণকংগ্রেসসমূহের সিদ্ধান্তসকল এবং রাষ্ট্রের উর্ধ্বতন পর্যায়ভুক্ত শাসন-পরিচালক সংস্থাসমূহের সিদ্ধান্তসকল ও আদেশসমূহ পালন করিবে।

স্থানীয় জন-পরিষদসমূহ আইনানুমোদিত কর্তৃত্বসীমার মধ্যে সিদ্ধান্তসমূহ ও আদেশসকল জারী করিবে।

৬৫ অনুচ্ছেদ ঃ 'কাউন্টি'-পর্যায়ের ও তদূর্ধ্বতন জন-পরিষদসমূহ তাহাদের অধীনস্থ বিভাগগুলির ও অধস্তন পর্যায়ের জন-পরিষদসমূহের কার্যে নির্দেশ দিবে এবং আইনের ব্যবস্থাসমূহ অনুসারে রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের কর্মচারিগণকে নিয়োগ অথবা অপসারণ করিবে।

'কাউন্টি'-পর্যায়ের ও তদূর্ধ্বতন জন-পরিষদসমূহের পরবর্তী অধস্তন পর্যায়ের গণকংগ্রেসসমূহ কর্তৃক গৃহীত অসঙ্গত সিদ্ধান্তসকল কার্যকর করিবার ব্যাপার স্থগিত রাখিবার এবং তাহাদের অধীনস্থ বিভাগসমূহ কর্তৃক প্রচারিত অসঙ্গত আদেশসকল ও নির্দেশসমূহ এবং অধস্তন পর্যায়ের জন-পরিষদসমূহ কর্তৃক প্রচারিত সিদ্ধান্তসমূহ ও আদেশসকল সংশোধন ও বাতিল করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

৬৬ অনুচ্ছেদ : স্থানীয় জন-পরিষদসমূহ সমপর্যায়ের গণ-কংগ্রেসসমূহ ও রাষ্ট্রের পরবর্তী উর্ধ্বতন শাসন-পরিচালক সংস্থাসমূহের নিকট দায়ী থাকিবে এবং তাহাদের নিকট কার্যবিবরণ পেশ করিবে।

সমগ্র দেশে স্থানীয় জন-পরিষদসমূহ হইতেছে রাষ্ট্রের শাসন-পরিচালক সংস্থা—যে সংস্থাসমূহ রাষ্ট্র পরিষদের ঐক্যবিধায়ক নেতৃত্বাধীন ও অধীনস্থ থাকিবে।

পঞ্চম খণ্ড : জাতীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক এলাকাগুলির সংস্থাসমূহ

৬৭ অনুচ্ছেদ : সমস্ত স্বয়ংশাসিত অঞ্চল, সমস্ত স্বয়ংশাসিত 'চৌ' ও সমস্ত স্বয়ংশাসিত 'কাউন্টি'র স্বায়ত্তশাসন-পরিচালক সংস্থা-সমূহ সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডে নির্দেশিত রাষ্ট্রের স্থানীয় সংস্থাসমূহের সংগঠন-নির্ধারক মৌলিক নীতিসমূহ অনুসারে গঠিত হইবে। প্রত্যেক স্বায়ত্তশাসন-পরিচালক সংস্থার রূপ কোন নির্দিষ্ট এলাকায় আঞ্চলিক স্বয়ংশাসন-ক্ষমতাপ্রাপ্ত জাতি বা জাতি-সমূহের জনগণের অধিকাংশের অভিপ্রায় অনুসারে স্থির হইবে।

৬৮ অনুচ্ছেদ : একত্র কিছুসংখ্যক জাতি-অধ্যুষিত সমস্ত স্বয়ংশাসিত অঞ্চলে, সমস্ত স্বয়ংশাসিত 'চৌ'তে, সমস্ত স্বয়ংশাসিত

'কাউন্টি'তে স্বায়ত্তশাসন-পরিচালক সংস্থাসমূহে প্রত্যেক জাতির যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের অধিকার থাকিবে।

৬৯ **অনুচ্ছেদ**ঃ সমস্ত স্বয়ংশাসিত অঞ্চল, সমস্ত স্বয়ংশাসিত 'চৌ' ও সমস্ত স্বয়ংশাসিত 'কাউন্টি'র স্বায়ত্তশাসন-পরিচালক সংস্থাসমূহ সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডে নির্দেশিত রাষ্ট্রের স্থানীয় সংস্থাসমূহের কার্যাবলী ও ক্ষমতাসমূহ পরিচালনা করিবে।

৭০ **অনুচ্ছেদ**ঃ সমস্ত স্বয়ংশাসিত অঞ্চল, সমস্ত স্বয়ংশাসিত 'চৌ' ও সমস্ত স্বয়ংশাসিত 'কাউন্টি' সংবিধান ও আইন দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃত্বসীমার মধ্যে স্বয়ংশাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবে।

সমস্ত স্বয়ংশাসিত অঞ্চল, সমস্ত স্বয়ংশাসিত 'চৌ' ও সমস্ত স্বয়ংশাসিত 'কাউন্টি'র স্বায়ত্তশাসন-পরিচালক সংস্থাসমূহ আইন দ্বারা নির্ধারিত কতৃত্বসীমার মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব স্থানীয় আর্থিক ব্যবস্থাসমূহ পরিচালনা করিবে।

সমস্ত স্বয়ংশাসিত অঞ্চল, সমস্ত স্বয়ংশাসিত 'চৌ' ও সমস্ত স্বয়ংশাসিত 'কাউন্টি'র স্বায়ত্তশাসন-পরিচালক সংস্থাসমূহ রাষ্ট্রের সামরিক ব্যবস্থা অনুসারে তাহাদের স্থানীয় জননিরাপত্তা-বাহিনী সংগঠন করিবে।

সমস্ত স্বয়ংশাসিত অঞ্চল, সমস্ত স্বয়ংশাসিত 'চৌ' ও সমস্ত স্বয়ংশাসিত 'কাউন্টি'র স্বায়ত্তশাসন-পরিচালক সংস্থাসমূহ স্বয়ংশাসন-ক্ষমতা-পরিচালনা-বিধায়ক নিয়মাবলী এবং কোন নির্দিষ্ট এলাকার জাতি বা জাতিসমূহের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহের পক্ষে উপযুক্ত অন্যান্য বিশেষ বিশেষ নিয়ম রচনা করিতে এবং এইরূপ যে কোন নিয়মাবলী জাতীয় গণকংগ্রেসের স্ট্যাণ্ডিং কমিটীর নিকট অনুমোদনের জন্য দাখিল করিতে পারিবে।

৭১ **অনুচ্ছেদ**ঃ সমস্ত স্বয়ংশাসিত অঞ্চল, সমস্ত স্বয়ংশাসিত 'চৌ' ও সমস্ত স্বয়ংশাসিত 'কাউন্টি'র স্বায়ত্তশাসন-পরিচালক

সংস্থাসমূহ তাহাদের কর্তব্যসকল-সম্পাদনে কোন নির্দিষ্ট এলাকার জাতি বা জাতিসমূহের দ্বারা সাধারণতঃ ব্যবহৃত কথিত ও লিখিত ভাষা বা ভাষাসমূহ প্রয়োগ করিবে।

৭২ **অনুচ্ছেদ ঃ** স্বয়ংশাসনব্যবস্থা-পরিচালনায় সমস্ত স্বয়ংশাসিত অঞ্চল, সমস্ত স্বয়ংশাসিত 'চৌ' ও সমস্ত স্বয়ংশাসিত 'কাউন্টি'র স্বায়ত্তশাসন-পরিচালক সংস্থাসমূহের অধিকার সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা এবং বিভিন্ন জাতিগত সংখ্যালঘুগণকে তাহাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নকার্যে সহায়তা করা রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন সংস্থাসমূহের পক্ষে কর্তব্য হইবে।

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ গণ-আদালতসমূহ ও গণ-আইন-তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা

৭৩ **অনুচ্ছেদ ঃ** চীনা জন-গণতন্ত্রে সর্বোচ্চ গণ-আদালত, স্থানীয় গণ-আদালতসমূহ ও বিশেষ গণ-আদালতসমূহ কর্তৃক বিচার-কর্তৃত্ব পরিচালিত হইবে।

৭৪ **অনুচ্ছেদ ঃ** সর্বোচ্চ গণ-আদালতের বিচারাধিপতির এবং স্থানীয় গণ-আদালতসমূহের বিচারাধিপতিগণের কার্যকাল চারি বৎসর হইবে।

গণ-আদালতসমূহের সংগঠন আইন অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

৭৫ **অনুচ্ছেদ ঃ** গণ-আদালতসমূহে বিচার-সম্বন্ধীয় কার্যক্রমে জনগণের আইন সংক্রান্ত পরামর্শদাতা (নিয়োগের) ব্যবস্থা আইন অনুসারে প্রযুক্ত হইবে।

৭৬ **অনুচ্ছেদ ঃ** আইন দ্বারা অন্যরূপ ব্যবস্থা না হইলে গণ-আদালতগুলিতে মামলাসমূহের প্রকাশ্যে শুনানী হইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার থাকিবে।

৭৭ অনুচ্ছেদ ঃ সমস্ত জাতির নাগরিকগণের আদালত-সংক্রান্ত কার্যক্রমে তাহাদের স্ব স্ব কথিত ও লিখিত ভাষাসমূহ ব্যবহার করিবার অধিকার থাকিবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সাধারণতঃ ব্যবহৃত কথিত বা লিখিত ভাষা-অনভিজ্ঞ কোন পক্ষের জন্য গণ-আদালতসমূহকে ভাষান্তরিত করণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সমগ্রভাবে বা বহুলাংশে জাতিগত কোন সংখ্যালঘুর দ্বারা অধ্যুষিত কোন এলাকায়, অথবা যেখানে কিছুসংখ্যক জাতি একত্র বাস করে, সেখানে গণ-আদালতসমূহে সেই অঞ্চলে সাধারণতঃ ব্যবহৃত ভাষায় শুনানী হইবে এবং রায়সকল, বিজ্ঞপ্তিসমূহ ও গণ-আদালত-গুলির অন্যান্য সমস্ত দলিলপত্র সেই ভাষায় প্রচারিত হইবে।

৭৮ অনুচ্ছেদ ঃ কেবল আইন-অনুযায়ী ন্যায়বিচার-বিধানে গণ-আদালতসমূহ স্বাধীন হইবে।

৭৯ অনুচ্ছেদ ঃ সর্বোচ্চ গণ-আদালত হইতেছে উচ্চতম বিচার-সম্বন্ধীয় সংস্থা।

সর্বোচ্চ গণ-আদালত স্থানীয় গণ-আদালতসমূহ ও বিশেষ গণ-আদালতসমূহের বিচার-সংক্রান্ত কার্যের তত্ত্বাবধান করিবে; ঊর্ধ্বতন গণ-আদালতসমূহ অধস্তন গণ-আদালতসমূহের বিচার-সংক্রান্ত কার্যের তত্ত্বাবধান করিবে।

৮০ অনুচ্ছেদ ঃ সর্বোচ্চ গণ-আদালত জাতীয় গণকংগ্রেসের নিকট দায়ী থাকিবে এবং তাহার নিকট, অথবা জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন না চলিবার সময় তাহার স্ট্যাণ্ডিং কমিটীর নিকট কার্যবিবরণ পেশ করিবে। স্থানীয় গণ-আদালতসমূহ সমপর্যায়ের স্থানীয় গণকংগ্রেসসমূহের নিকট দায়ী থাকিবে এবং তাহাদের নিকট কার্যবিবরণ পেশ করিবে।

৮১ অনুচ্ছেদ : চীনা জন-গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ গণ-আইন-তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা আইন-পালনের নিশ্চয়তা-বিধানের জন্য রাষ্ট্র-পরিষদের সকল বিভাগ, রাষ্ট্রের সমস্ত স্থানীয় সংস্থা, রাষ্ট্রের সংস্থা-সমূহে কার্যরত ব্যক্তিগণ এবং নাগরিকগণের উপর আইন-সংক্রান্ত তত্ত্বাবধানকর্তৃত্ব পরিচালনা করিবে। গণ-আইন-তত্ত্বাবধায়ক সংস্থার স্থানীয় সংস্থাসমূহ ও বিশেষ গণ-আইন-তত্ত্বাবধায়ক সংস্থাসমূহ আইনানুমোদিত সীমার মধ্যে আইন-সংক্রান্ত তত্ত্বাবধান-কর্তৃত্ব পরিচালনা করিবে।

গণ-আইন-তত্ত্বাবধায়ক সংস্থার স্থানীয় সংস্থাসমূহ ও বিশেষ গণ-আইন-তত্ত্বাবধায়ক সংস্থাসমূহ ঊর্ধ্বতন পর্যায়ের গণ-আইন-তত্ত্বাবধায়ক সংস্থাসমূহের পরিচালনাধীনে কার্য করিবে এবং এই সমস্ত (সংস্থা) সর্বোচ্চ গণ-আইন-তত্ত্বাবধায়ক সংস্থার ঐক্যবিধায়ক পরিচালনাধীনে কার্য করিবে।

৮২ অনুচ্ছেদ : সর্বোচ্চ গণ-আইন-তত্ত্বাবধায়ক সংস্থার প্রধান আইন-তত্ত্বাবধায়কের কার্যকাল চারি বৎসর হইবে।

গণ-আইন-তত্ত্বাবধায়ক সংস্থাসমূহের সংগঠন আইন অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

৮৩ অনুচ্ছেদ : গণ-আইন-তত্ত্বাবধায়ক সংস্থার স্থানীয় সংস্থাসমূহ তাহাদের কর্তৃত্ব-পরিচালনার ব্যাপারে স্বাধীন হইবে এবং রাষ্ট্রের স্থানীয় সংস্থসমূহের হস্তক্ষেপের অধীন হইবে না।

৮৪ অনুচ্ছেদ : সর্বোচ্চ গণ-আইন-তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা জাতীয় গণকংগ্রেসের নিকট দায়ী থাকিবে এবং তাহার নিকট, অথবা জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন না চলিবার সময় তাহার স্ট্যাণ্ডিং কমিটীর নিকট কার্যবিবরণ পেশ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারসমূহ ও কর্তব্যসমূহ

৮৫ অনুচ্ছেদ ঃ আইনের নিকট চীনা জন-গণতন্ত্রের নাগরিকগণ সমান।

৮৬ অনুচ্ছেদ ঃ চীনা জন-গণতন্ত্রের যে সমস্ত নাগরিক ১৮ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, জাতি, বর্ণ, পেশা, সামাজিক উৎপত্তি, ধর্মবিশ্বাস, শিক্ষা, সম্পত্তিগত মর্যাদা অথবা বাসস্থানের দৈর্ঘ যাহাই হউক না কেন, বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ ও আইন অনুসারে ভোটদান ও নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার হইতে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ ছাড়া, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাহাদের ভোটদানের ও নির্বাচনপ্রার্থী হইবার অধিকার থাকিবে।

নারীদের ভোটদানের ও নির্বাচনপ্রার্থিনী হইবার পুরুষের সমান অধিকার থাকিবে।

৮৭ অনুচ্ছেদ ঃ চীনা জন-গণতন্ত্রের নাগরিকগণের বাক্যের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, (জন) সমাবেশের স্বাধীনতা, সঙ্ঘ-সমিতির স্বাধীনতা, শোভাযাত্রার স্বাধীনতা ও বিক্ষোভ-প্রদর্শনের স্বাধীনতা থাকিবে। প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা দ্বারা রাষ্ট্র নাগরিকগণের এই সমস্ত স্বাধীনতা-ভোগের নিশ্চয়তা দিতেছে।

৮৮ অনুচ্ছেদ ঃ চীনা জন-গণতন্ত্রের নাগরিকগণের ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা থাকিবে।

৮৯ অনুচ্ছেদ ঃ চীনা জন-গণতন্ত্রের নাগরিকগণের দৈহিক স্বাধীনতা অলঙ্ঘনীয়। কোন গণ-আদালতের সিদ্ধান্ত ব্যতীত অথবা কোন গণ-আইন-তত্ত্বাবধায়ক সংস্থার অনুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিককেই গ্রেপ্তার করিতে পারা যাইবে না।

৯০ অনুচ্ছেদ : চীনা জন-গণতন্ত্রের নাগরিকগণের বাসগৃহসমূহ অলঙ্ঘনীয় এবং চিঠিপত্রের গোপনীয়তা আইনতঃ রক্ষিত হইবে।

চীনা জন-গণতন্ত্রের নাগরিকগণের বাসস্থানের স্বাধীনতা এবং তাহাদের বাসস্থান-পরিবর্তনের স্বাধীনতা থাকিবে।

৯১ অনুচ্ছেদ : চীনা-জনগণতন্ত্রের নাগরিকগণের কার্য করিবার স্বাধীনতা থাকিবে। এই অধিকারভোগের নিশ্চয়তাবিধানের জন্য রাষ্ট্র জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত উন্নয়ন দ্বারা ক্রমাগত অধিকতর কর্মসংস্থান ও কর্মের উন্নততর অবস্থা সৃষ্টি ও বেতনের ব্যবস্থা করিবে।

৯২ অনুচ্ছেদ : চীনা জন-গণতন্ত্রে শ্রমিকগণের বিশ্রাম ও অবকাশলাভের অধিকার আছে। এই অধিকারভোগের নিশ্চয়তা-বিধানের জন্য রাষ্ট্র শ্রমিক ও অফিস-কর্মীদের জন্য কার্যের সময় ও ছুটির দিনসমূহ নির্ধারিত করিবে। সেই সঙ্গে ইহা (রাষ্ট্র) শ্রমিকগণের বিশ্রামলাভ ও তাহাদের স্বাস্থ্যগঠনের জন্য ক্রমশঃ উল্লেখযোগ্য সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ করিবে।

৯৩ অনুচ্ছেদ : চীনা জন-গণতন্ত্রে শ্রমিকগণের বৃদ্ধবয়স, পীড়া ও কর্মে অক্ষমতায় যথেষ্ট সাহায্যলাভের অধিকার থাকিবে। এই অধিকার-ভোগের নিশ্চয়তা-বিধানের জন্য রাষ্ট্র সামাজিক বীমা, সামাজিক সাহায্য ও জনস্বাস্থ্যরক্ষা-সংক্রান্ত সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিবে এবং ক্রমান্বয়ে এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ করিবে।

৯৪ অনুচ্ছেদ : চীনা জন-গণতন্ত্রের নাগরিকগণের শিক্ষার অধিকার থাকিবে এই অধিকার-ভোগের নিশ্চয়তা-বিধানের জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়সমূহ এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন ও ক্রমশঃ তৎসমুদয়ের সম্প্রসারণ করিবে।

তরুণগণের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের প্রতি রাষ্ট্র বিশেষ মনোযোগ দান করিবে।

৯৫ অনুচ্ছেদ : চীনা জন-গণতন্ত্র নাগরিকগণের বৈজ্ঞানিক গবেষণা, সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টি এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে নিযুক্ত হইবার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে। বিজ্ঞান, শিক্ষা, সাহিত্য, কলা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত নাগরিকগণকে তাহাদের সৃজনমূলক কার্যপরিচালনায় রাষ্ট্র উৎসাহ ও সাহায্যদান করিবে।

৯৬ অনুচ্ছেদ : চীনা জন-গণতন্ত্রে নারীরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও গার্হস্থ্য—সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করিবে।

রাষ্ট্র বিবাহ, পরিবার এবং মাতা ও শিশুকে রক্ষা করিবে।

৯৭ অনুচ্ছেদ : চীনা জন-গণতন্ত্রের নাগরিকগণের রাষ্ট্রের সংস্থাসমূহে কার্যরত যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনলঙ্ঘন অথবা কর্তব্যে অবহেলার জন্য রাষ্ট্রের যে কোন পর্যায়ের যে কোন সংস্থার নিকট লিখিত বা মৌখিক বিবৃতি দান করিয়া অভিযোগ আনয়ন করিবার অধিকার থাকিবে। যে সমস্ত লোক নাগরিক হিসাবে তাহাদের অধিকার রাষ্ট্রের সংস্থাসমূহে কার্যরত ব্যক্তিগণ কর্তৃক লঙ্ঘিত হওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তাহাদের ক্ষতিপূরণলাভের অধিকার থাকিবে।

৯৮ অনুচ্ছেদ : চীনা জন-গণতন্ত্র বিদেশবাসী চীনাদের যথোপযুক্ত অধিকারসমূহ ও স্বার্থসকল রক্ষা করিবে।

৯৯ অনুচ্ছেদ : চীনা জন-গণতন্ত্র কোন ন্যায়সঙ্গত বিষয়সমর্থন, শান্তি-আন্দোলনে যোগদান অথবা বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপে নিযুক্ত হওয়ার জন্য অভিযুক্ত যে কোন বিদেশী নাগরিককে আশ্রয়গ্রহণের অধিকার মঞ্জুর করিবে

১০০ অনুচ্ছেদ ঃ চীনা জনগণতন্ত্রের নাগরিকগণ অবশ্যই সংবিধান ও আইন মানিয়া চলিবে, কার্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে, জনসাধারণের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে এবং সামাজিক নীতিসমূহকে শ্রদ্ধা করিবে।

১০১ অনুচ্ছেদ ঃ চীনা জন-গণতন্ত্রের সরকারী সম্পত্তি পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়। সরকারী সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ও তাহা রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

১০২ অনুচ্ছেদ ঃ আইন-অনুযায়ী কর দেওয়া চীনা জন-গণতন্ত্রের নাগরিকগণের কর্তব্য।

১০৩ অনুচ্ছেদ ঃ মাতৃভূমিকে রক্ষা করা চীনা জন-গণতন্ত্রের প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য।

আইন-অনুযায়ী সামরিক কার্য সম্পাদন করা চীনা জন-গণতন্ত্রের নাগরিকগণের সম্মানজনক কর্তব্য।

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় পতাকা, রাষ্ট্র-প্রতীক ও রাজধানী

১০৪ অনুচ্ছেদ ঃ চীনা জন-গণতন্ত্রের জাতীয় পতাকা পাঁচটি তারকাযুক্ত রক্তবর্ণ পতাকা হইবে।

১০৫ অনুচ্ছেদ ঃ চীনা জন-গণতন্ত্রের রাষ্ট্র-প্রতীক হইবে ঃ শস্যের শীষসমূহের বেষ্টনীর নিম্নভাগে দাঁত-যুক্ত একটি চাকা এবং এই বেষ্টনীর মধ্যস্থলে পাঁচটি তারকার আলোকের নীচে 'তিয়েন আন মেন' থাকিবে।

১০৬ অনুচ্ছেদ ঃ চীনা জন-গণতন্ত্রের রাজধানী হইল পিকিং।

পরিশিষ্ট—চার

চীনের সংবিধানে ব্যবহৃত বাঙ্গলা পরিভাষা

চীনের সংবিধানের ইংরেজী অনুবাদে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান ইংরেজী শব্দের পরিবর্তে বাঙ্গলা অনুবাদে যে সমস্ত বাঙ্গলা পরিভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার তালিকা দেওয়া হইল :

অধ্যায়—Chapter.
অনুচ্ছেদ—Article,
অর্ধ-সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি—Semi-socialist economy.
আইন-তত্ত্বাবধান কমিটী—Procuratorial committee.
আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতা (আঞ্চলিক স্বয়ংশাসন-ক্ষমতা)
—Regional autonomy.
আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতি—Bureaucrat-capitalist.
উপরাষ্ট্রপতি—Vicc-Chairman.
কেন্দ্রীয় গণ-সরকার—Central People's Government.
খণ্ড—Section.
গণআদালত—People's Court.
গণতন্ত্রসম্মত কেন্দ্রায়ত্ত ক্ষমতা—Democratic centralism.
গণ-তান্ত্রিক একনায়কত্ব—Democratic dictatorship.
চীনা জন-গণতন্ত্র—People's Republic of China.
জনগণের আইনসংক্রান্ত পরামর্শদাতা—People's assessor.
গণতান্ত্রিক গণ-রাষ্ট্রসমূহ—Peopples democracies.
জাতিগত সংখ্যালঘু—National minority.
জাতিসমূহ-সংক্রান্ত কমিটী—Nationalities committee.

জাতীয় গণকংগ্রেস—National people's congress.
জাতীয় প্রতিরক্ষা-পরিষদ—Council of National Defence.
জাতীয় স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতাসম্পন্ন এলাকা (জাতীয় স্বয়ংশাসিত এলাকা)—National autonomous area.
দাঁত-যুক্ত চাকা—Cogwheel.
ধনী-কৃষকগণ সংক্রান্ত অর্থনীতি—Rich-peasants economy.
নির্দেশসমূহ—Directives.
নির্বাচন আইন—Electoral law.
নির্বাচকমণ্ডলী—Electorate.
নির্বাচক সংস্থা—Electoral unit.
পুঁজিপতি—Capitalist.
প্রতিনিধিগণ—Deputies.
প্রধান আইন-তত্ত্বাবধায়ক—Chief procurator.
প্রধানমন্ত্রী—Premier.
প্রাদেশিক গণকংগ্রেস—Provincial people's congress.
বহুজাতি-সমন্বিত রাষ্ট্র—Multi-national state,
বিচার-সংক্রান্ত কমিটী—Judicial committee.
চারাধিপতি (গণ-আদালতের, সর্বোচ্চ গণ-আদালতের)—President, (of people's court, Supreme People's court.
বিশেষ গণ-আদালত—Special people's court.
বিশেষ বিধান—Decree.
বৈদেশিক দূত বা প্রতিনিধিগণের পরিচয়পত্র-পরীক্ষাকারী কমিটী—Credentials committee.
ভূমিকা—Preamble.

রাজনৈতিক পরামর্শমূলক চীনা গণ-সম্মেলন—People's political consultative conference.

রাষ্ট্রপতি—Chairman.

রাষ্ট্র পরিষদ—State Council.

রাষ্ট্রীয়-ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি—State-capitalist economy.

রাষ্ট্রের প্রতীক—State-emblem.

রাষ্ট্রের মালিকানা-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি—State-owned economy.

সংবিধান—Constitution.

সমবায়মূলক অর্থনীতি—Co-operative economy.

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি—Socialist economy.

সম্পাদকমণ্ডলী—Presidium.

সর্বোচ্চ গণ-আইন-তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা —Supreme people's procuratorate.

সর্বোচ্চ গণ-আদালত—Supreme people's court.

সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মেলন—Supreme state conference.

সহকারী প্রধানমন্ত্রী—Vice-Premier.

সহকারী প্রধান আইন-তত্ত্বাবধায়ক —Deputy chief procurator.

স্থানীয় গণকংগ্রেস—Local people's congress.

স্থানীয় জন-পরিষদ—Local people's council.*

---

* Constituent Assembly'র বাঙ্গলা পরিভাষা 'গণপরিষদ' হওয়ায় 'People's Council'-এর বাঙ্গলা পরিভাষা 'জন-পরিষদ' করা হইল।

সমাপ্ত